বিয়ের কনে

শ্রীব্রজমোহন দাশ

প্রকাশক—
শ্রীকিরীটিকুমার পাল
তরুণ-সাহিত্য-মন্দির,
৫৯, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অগ্রহায়ণ—১৩৪৪

রাজসংস্করণ—
দাম দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীবলাইচরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড-প্রিন্টিং-হাউস
৭১।এ, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিয়ের কনে

অঙ্গরাগ

কথা—শ্রীব্রজমোহন দাশ

শিল্পী—শ্রীবিজয় রায়চৌধুরী

ব্লক—ন্যাশানাল হাফ্‌টোন কোং

—পরিকল্পনা—

প্রকাশ ও প্রচার-পন্থা—

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

স্বত্বাধিকারী—

শ্রীকিরীটিকুমার পাল

তরুণ-সাহিত্য-মন্দির

—এই গ্রন্থকারের লেখা—

অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

ছোটদের আহরিকা (সম্পাদিত)			...	১৵৹
বনফুল	...	...	...	১৲
মেওয়া	..	...	...	১৲
বেইমান	..	...	..	১৲
জলধর-কথা (সম্পাদিত)		...	...	২৲

বড়ো-ভালো-লাগে

(বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দের শিশুসাহিত্য হইতে সঙ্কলিত) ১৲

সুরের ভাষা

(নবযুগের গান ও বাংলার বিশিষ্ট সুরশিল্পীগণের
স্বরলিখন সহ অপূর্ব্ব গীতিমাল্য) ... ২৲

প্রাপ্তিস্থান—তরুণ-সাহিত্য-মন্দির

ও

বাংলার সমস্ত পুস্তকালয়

বিয়ের কনে

সমাজ-চিত্র

শ্রীব্রজমোহন দাশ

কলেজে অরুণের প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। লেখাপড়ায় সে যে কতটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল তা' বলা যায়না, কিন্তু সমস্ত কলেজটাকে সে যেমন আপনার ক'রে বুকে টেনে নিতে জানতো, তেমনটি বুঝি আর কেউ পারতোনা। সব-চাইতে তার একটা বেশী ক্ষমতা ছিল, সেটা তার সাজিয়ে-গুছিয়ে বলবার শক্তি। দেশের প্রতি সে এতটা অনুরাগ কথায়-কথায় প্রকাশ ক'রে ফেলতো যে, তার মূল্য হিসেবে ধরতে গেলে কিছুই থাকেনা। সে লেকচারের মুখে প্রায়ই ব'লে যেতো—"দেশের কাজ!" কিন্তু এই কাজটা যে সে কেমন ক'রে পালন করতো তা' কেউ বুঝে উঠতে পারেনি। একটা দল যখন কোন একটা লোককে উঁচু ক'রে দাঁড় করাতে যায়, তখন আর একটা তেমনি পুষ্ট লোকমত তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে প্রায়ই দেখা দেয়। অরুণকেও কতকগুলো লোক যেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতো, তেমনি অপর কতকগুলোও তার অসারত্ব প্রতিপন্ন করতে

খড়্গহস্ত হ'য়ে দাঁড়াতো। তাই অবনীকুমার যখন পিতার অক্ষমতা প্রচার ক'রে বয়স্থা ভগিনীটির জন্য কেশবচন্দ্রকে ধ'রে বসলো, তখন একটু হেসে গোলদিঘীর অপর পাড়্‌টার দিকে আঙুল বাড়িয়ে কেশবচন্দ্র উত্তর করলে, "ঐ যে তোমাদের মহর্ষি দেবব্রত—যাও, অভীষ্ট পূর্ণ হবে। আমার কাছে কেন ভাই ?"

অবনী যখন পাঁচটি বোনের ভাই, তখন এ-অপমানের জন্যে যে সে আগে থেকে প্রস্তুত হ'য়ে না-এসেছিলো তা' নয়—তবুও কেশবের উপর তার যেন একটু আধিপত্য ছিল আর এইটের উপর জোর ক'রেই সে পিতাকে নিশ্চিন্ত হ'তে ব'লে এসেছিল।

কেশবের নজরে এ-অভিমানটা যে পড়লোনা এমন নয়; সে স্নেহভরে অবনীকুমারের হাত দুটী ধ'রে বললে, "ভয় কি রে অবনী! তোর কেশবদাদা তো আছেই—যারা আপনার নামটা জাহির করবার জন্যে দেশের কাজের দোহাই দিয়ে বেড়ায়, তাদের একবার ধ'রেই দেখনা!"

*

* *

অবনীর কথা শুনে অরুণ লাফিয়ে উঠলো। প্রথমেই তো সে হেসে কাজটাকে এত তুচ্ছ ক'রে, এত সহজ ক'রে ধরলে যে অবনী তা' বিশ্বাস করতেই পারলেনা। কেবলমাত্র অরুণ অবজ্ঞাভরে হেসে একটিবার বললে, "এই কথা! দাঁড়া—"

এত গর্ব্বের সঙ্গে কথা দুটো বার হ'লো যে, তার স্বরটা যেন ব'লে দিলে—অরুণের কাছে এত সামান্য কাজটা নিয়ে অবনীর আসাই উচিত হয়নি। তারপর অরুণ বসবার বেঞ্চিটার উপর দাঁড়িয়ে উঁচু-গলায় আরম্ভ করলে, "আজ-কাল বাঙ্লা-দেশে মেয়ের বিবাহ দেওয়া সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে যে কতটা কঠিন তা' বোধহয় আপনারা সকলেই জানেন; অপারক পিতার জাতিকুল রক্ষা করাও যে দেশের কাজ..."

আজকে কিন্তু অন্যদিনের মত অরুণের অভিমতটা লোকে বড একটা নিলেনা। সভায় জনসমাগন হওয়া দূরের কথা, ক্রমেই শ্রোতার অভাব হ'য়ে পড়লো।

একটা ঘণ্টা মিথ্যে চেঁচিয়ে গ্যাসের বাতি জ্বালার সঙ্গে-সঙ্গে অরুণচন্দ্র গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে নেমে পড়লো আর অবনীর দিকে চেয়ে-চেয়ে বলতে লাগলো, "বাঙ্লা দেশে মানুষ নেই অবনী—আমি আর কি ক'রবো! চেষ্টা তো করলুম, দেখলে তো?"

এর উত্তর অবনীকে দিতে হয়নি, কিন্তু সেই পাতলা ভাঙা-সভার লোকগুলোর মধ্যে থেকে একজন ব'লে উঠলো, "বাঙলা দেশ ছাড়া তুমিও তো নও অরুণ, অপরকে না-ব'লে এ-কাজটা তো তুমি নিজেই করতে পারো?"

যদি সমস্ত সভাটা তখন অরুণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতো তাহ'লেও অরুণ এতটা ভয় পেতোনা, যেমনটা সে কেশবের এই সরল কথাটায় পেয়েছে। কেশব অরুণের এমন জায়গাটায় ঘা দিয়েছিল, যেখানে তার যুক্তি তর্ক তুলবার এতটুকুও পথ ছিলনা। কাজেই সে

অপমানের ভয়ে—মনে-মনে অবনীর উপর যতটাই রাগ করুকনা কেন, আপনার আসনটা ঠিক রাখবার জন্যে খপ্ ক'রে ব'লে ফেললে, "সে তো বেশ কথা ভাই, অরুণকে নিয়ে তোমাদের যদি এত বড় কাজটা চ'লে যায় তাহ'লে অরুণ আপনাকে কম ভাগ্যবান মনে করবেনা।"

*

* *

অবনীদের অবস্থাটা এমন ছিলনা যে ইট-বার-করা দেওয়ালগুলোয় একটা বালির পোঁচ দিয়ে দেয়। ছাদের একটা দিক ভেঙে পড়তে বসেছে দেখে, কাল অবনী আর কেশব একটা বাঁশ দিয়ে তা' কোন রকমে আট্‌কে রেখেছে। কেশব উঠনের বড়-বড় কাঁটাগাছগুলো অনভ্যস্ত হাতে নিড়েন দিয়ে উপ্‌ড়োতে গিয়ে আঙুলগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেছে। লক্ষ্মী তার আঙুলে একটা জলপটী বাঁধতে-বাঁধতে ছোট একটি বেদনার স্বরে বললে, "এ কেন তুমি করতে গেলে কেশব-দা, তোমার কি এসব অভ্যেস আছে ?"

"আজকে আমার লক্ষ্মী বোনের বে' যে রে লক্ষ্মী! ভিখিরীদের বোন্ আজ রাণী হ'তে চ'লেচে, তার হতভাগ্য ভায়েরা কি তাকে একটা জঙ্গলে বসিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে পারে দিদি ?"

তারপর কেশব হাসতে-হাসতে বললে, "হাঁরে লক্ষ্মি! তোর কেশব-দা

যদি কথনো তোর ঘরে যায়, তখন তোর অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার থেকে তাকে তো একমুঠো দিবি বোন্?"

লক্ষ্মী লজ্জায় এতটুকু হ'য়ে গেল। কেশব একটু থেমে মাটির দিকে চেয়ে আবার বলতে লাগলো, "দেখিস দিদি, পরের ঘরে এতটুকু দোষ ক'রে তোর ভায়েদের যেন ছোট ক'রে দিসনি বোন্!"

লক্ষ্মীর চোখ দুটো জলে ভ'রে এলো। এতটা স্নেহ কেউ কখনো তাকে করেনি।

পাঁচ-পাঁচটা মেয়ে নিয়ে বড় গরীব যামিনী চাটুজ্যে সংসারে তিতিবিরক্ত হ'য়ে প্রায়ই বলতেন, "এত লোকের এত মরে, তোদের কি মরণ নেই লক্ষ্মি!"

লক্ষ্মী জানতো সে আর তার ছোট বোন্‌গুলো যদি এ-সংসারে না-আসতো, তাহ'লে এই ষাট বছরের বুড়ো বাপকে আজ এতটা ভেবে-চিন্তে সারা হ'তে হ'তো না। তাই সে সন্ধ্যে-বেলায় হরির তলায় প্রদীপটি রেখে হাত দু'টি জোড় ক'রে বলতো, "ঠাকুর আমাদের তুলে নাও, বাবার কষ্ট যে আর দেখতে পারিনা ঠাকুর!"

*

* *

ভিতরটায় যখন কোনরকমে স্বস্তি পাওয়া যায়না তখন বাহিরটা এত রুক্ষ হ'য়ে ওঠে যে, এতটুকু স্নেহ-করুণা তার কোথাও লুকিয়ে

আছে ব'লে মানুষ মোটেই ধরতে পারেনা। তাই ঠিক বিয়ের পর-দিনটায় সকলের অনভিমতগুলো একধারে ঠেলে অরুণ যখন—'বৃথা সময় নষ্ট করতে পারবোনা' ব'লে বেরিয়ে পড়লো, তখন মেয়ের বাপ এসে বল্লেন, "এ আমার কেন মিছে গলগ্রহ বাবা, আমার লক্ষ্মী আজ তো আর আমার নয় অরুণ! মাকে আমার তোমার হাতে দিয়ে এতদিনের পর আমি নিষ্কৃতি পেয়েছি। এখন তোমার জিনিষ তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও বাবা!"

"একটা দিনে একজনের হাতে তুলে দিয়ে আপনি যদি কোনো দায়ীত্ব নেই ব'লে স'রে দাঁড়ান, তাহ'লে সেটা হাসির কথা ছাড়া আর কিছুই হয়না।"

"তুমি কি বোলচ' অরুণ!"

"স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে, আমার এই ফিলজফিতে এম-এ পড়বার সময় বিয়ে করবার এতটুকু অবসরই ছিলনা। এ-কেবল জানবেন, দেশের এক ব্রাহ্মণ তাঁর মেয়েটীকে পার করতে পাচ্ছিলেননা তাই তাঁর একটু উপকার করা গেল।"

যামিনী চাটুজ্যে এ-কথায় এতটুকু হ'য়ে গেলেন। অরুণের সামনে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে আর তাঁর সাহসই হ'লোনা। মানুষের এত বড় জায়গাটা অরুণ অধিকার ক'রে ব'সে রইলো যে, সেখানে কোনো স্নেহের সম্বন্ধই পাতানো চলেনা। তবুও মান-অভিমান দূর ক'রে দিয়ে তিনি একবার বললেন, "তোমাদের ঘরের লক্ষ্মীকে এ-দিনটায় বরণ ক'রে যে ঘরে তুলে নিতে হয় বাবা, তাই বলছিলুম।"

অরুণ এ-কথাটা এমন অশ্রদ্ধা ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিলে যে, কেশব আর সহ্য করতে পারলেনা ; রেগে বড়-বড় ক'রে সে বলতে লাগলো, "দেশের রীতি-নীতির উপরেই যাদের বিশ্বাস নেই—আপনাদের পূর্ব্ব-পুরুষের মতগুলোর উপরেই যাদের জোর নেই, তারা কোন্ লজ্জায় কোমর বেঁধে দেশের উন্নতি করতে দাঁড়ায় ?"

তাচ্ছিল্যের সহিত হেসে-হেসে অরুণ উত্তর করলে, "দুধের ভাঁড় উথ্‌লে উঠলে, তোমাদের ঘরও উথ্‌লে ওঠে নাকি কেশব ?"

"দেখ, তোমরা সভ্যজাতির নকল ক'রতে গিয়ে তাঁদের তো মোটে ছুঁতেই পারোনা, মাঝে থেকে এমন একটা কঠিন জিনিষের সৃষ্টি ক'রে ব'সো যে দেশের লোক তা' বুঝতেও পারেনা ; কাজেই শ্রদ্ধাও করেনা।"

এবার অরুণ লাল-লাল চোখ দুটো বার ক'রে সহজেই কেশবকে অপমান ক'রে ফেললে। কেশব সব পারতো, কিন্তু আপনার সম্ভ্রমের গায়ে এতটুকু ঘেঁস্ সে কোনোদিনই সহ্য ক'রে আসেনি, তাই খপ্ ক'রে একটা কথা বলবার পূর্ব্বে সে একবার পিছন ফিরে চাইতে গিয়ে ঘোমটার মধ্যে থেকে লক্ষ্মীর জলভরা চোখ দুটো খুব স্পষ্ট দেখতে পেলে। আর কি সে কিছু বলতে পারে ? ছুটে গিয়ে লক্ষ্মীর পিঠে বাঁ-হাতটা দিয়ে সে আপনার চোখ দুটো একবার মুছে ধীরে-ধীরে বলতে লাগলো, "লক্ষ্মীদিদি, তুই কাঁদিসনি। তোর কথা মনে ক'রেই তো তোর কেশব-দা আজ সব সহ্য ক'রে গেছে ; তোকে এতটুকুও দুষ্‌বার পথ রাখেনি।"

অরুণ কেশবের এই কথাগুলো শুনে বড় নীচতা প্রকাশ ক'রে ফেললে, বললে, "কেশব, এত বড একটা লোভ থাকলে—"

"খবরদার অরুণ, আমার লক্ষ্মী মায়ের অপমান করলে কেশব তা' কোনমতেই স'য়ে যাবেনা !"

উত্তরে কেশব যা' মুখে এলো অজ্ঞ লোকের মত ব'লে গেল।

মায়ের আসন শূন্য হবার পরদিন থেকেই সে এই ছোট মেয়েটিকে জগতের সমস্ত শ্রদ্ধা দিয়ে পূজো ক'রে এসেছে, তাই তার বিপক্ষে কোনো কথা উঠলে সে ছোট ভায়ের মত অবনীকে ভুলে যেতো, তার যামিনী কাকাকে ভুলে যেতো—লক্ষ্মী তখন তার চোখের কাছে অনেকটা পৃথক হ'য়ে দাঁড়াতো।

*

* *

রাগ ক'রে অরুণচন্দ্র যেদিন কলকাতায় ফিরে এলো, তার পাঁচ দিন পরে কেশব একদিন তার বাড়ীতে গিয়ে হাত দুটো ধ'রে বললে, "আমি তোমার কাছে যতই দোষ ক'রে থাকি অরুণ, তার সমস্ত শাস্তিটাই আজ হেসে মাথা পেতে নিতে এসেছি, কিন্তু তুমি সত্যি বল, আমার ওপর রাগ ক'রে সেই ছোট মেয়েটার প্রতি তুমি একটুও বিরূপ হওনি ?"

অরুণ তখন যাই ব'লে থাকুক, তারপর একটা বছর কেটে গেছে,

এর মধ্যে লক্ষ্মীর খবর সে একদিনও নেয়নি। মাঝে একটা ভাঙা-ভাঙা অক্ষরে বালির কাগজের এক পিঠে দু'চার ছত্র লেখা—লক্ষ্মী বড় গোপনে অরুণের নামে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। অরুণ শুধু কৌতূহল মেটাবার জন্যে চিঠিখানা একবার পড়তে বসেছিলো মাত্র। লক্ষ্মী লিখেছিলো—

শ্রীশ্রীদুর্গা।

ওগো, আমি তোমাকে একটা দিনে কতটা বুঝবো। তোমার পায়ের কাছে আমি অনেক অপরাধ করেছি, আমার সবটা ক্ষমা ক'রে শিখিয়ে দিয়ো, আমি আর কখনো ভুলবো না। তুমি যদি আমার ওপর রাগ কর, তবে কার মুখের দিকে চেয়ে আমি চোখের জল মুছবো—চিরকালই বাপ মায়ের বোঝা হ'য়ে থাকবো? তুমি তো জানো তাদের কত কষ্ট! তোমার পাতের নীচের ভাতগুলো কুড়িয়ে খেলেও যে আমার ঢের হবে। এ-জগতে আমায় কেউ মনে করে না; আমি বড় হতভাগী গো! তুমি আমায় মনে রাখলে আমার কিসের ভাবনা—আমি তাহ'লে রাণীর ওপর রাণী! ইতি—

সেবিকা—
লক্ষ্মী

অরুণ চিঠিখানা ঘৃণাভরে টেবিলের উপর ফেলে দিলে। তারপর ড্র' থেকে একটা রেশমী সুগন্ধী-খামে-মোড়া পত্র বের ক'রে পড়তে-

পড়তে অন্যমনস্কে ব'লে ফেললে, "রাণী, তোমার সঙ্গে এর তুলনাই হয়না!"

হায় অরুণ! ঐ পল্লী-মেয়েটার সাদা কথাগুলোর মধ্যে যতটা ভালোবাসা লুকিয়ে আছে, ততটা কি টেনিসন্ তাঁর কোনো কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন?

*

* *

ব্যারিষ্টার শিশির বাঁড়ুজ্যের বাড়ীতে অরুণের নিমন্ত্রণটা কাজে-অকাজে প্রায়ই পড়তো। এর ওপর সেখানে চায়ের টেবিলের পাশে ব'সে সন্ধ্যেবেলাটা অরুণ অনেক বড়-বড় তর্ক তুলে ছোট বড় সকলকেই এমনি কৌশলে হারিয়ে দিয়ে আসতো যে, ইতিহাসে, দর্শনে তার অ-যুক্তি কেউ খুঁজেই পেতোনা। তার একটা কারণ ছিলো। একে তো সে হাওয়ার মত এত তাড়াতাড়ি ব'লে যেতো যে কাউকে তা' বোঝবারই অবসর দিতোনা, তার উপর ভুলেও কোন জিনিষের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতো না। সে যা' বলতো সেটা কেবল কথার সমষ্টি হ'তো মাত্র। এইটেই তার চাতুরী—এইটেতেই তার জয়।

এ-বাড়ীর সম্মেলনটা আরম্ভ করতো [illegible] ছোট মেয়ে রাণী। রোজই সে অভিনন্দনের মত প্রথমেই [illegible] গেয়ে যেতো, আর অরুণ তাকে প্রশংসা করতে গিয়ে [illegible] "বাঙলা দেশটার

দ্বারে-দ্বারে তুমি যদি এমনি ক'রে গাইতে পারো রাণী, তাহ'লে অনেক-দিনের শুক্‌নো দেশটায় পুলক-বন্যা ব'য়ে যায়।"

রাণী হেসে পিয়নোটা বন্ধ ক'রে দিতো, বলতো, "এমন ক'রে লজ্জা দিলে কিন্তু আমি গাইবোনা তা' বলে দিচ্ছি অরুণবাবু!"

"সে কি রাণি, তোমার গানে যে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ আমাদের মাথার ওপর ঝ'রে পড়ে—"

এমনি ক'রে এখানে যে সান্ধ্য-সভাটা রোজই হ'তো তাতে বাজে বিষয় ভিন্ন আর কিছুরই আলোচনা হ'তো না। বন্ধুবান্ধব অনেকেই আসতেন, কিন্তু সকলেরই কোনো-না-কোনো একটা ঝোঁক ছিলো। কেউ আসতেন চা আর ডিমের ধ্বংস করতে, কেউ আসতেন শিশিরবাবুর সুপারিসে নিজের একটা কিছু যোগাড় ক'রে নিতে, আর অরুণ যেখানটায় বদ্ধ হ'য়েছিলো সেখানটায় এত বড় একটা লোভ ছিলো যে, সে অনেকবার চেষ্টা ক'রেও তা' কাটিয়ে উঠতে পারেনি। যতই হোক্, হিন্দুত্বটা কিন্তু সময়ে-সময়ে তার মনের ভিতর এমনই প্রবল হ'য়ে দাঁড়াতো যে, এককথায় সে এই কুসংস্কারগুলো বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধ'রে কোনমতেই ছাড়তে চাইতো না, কিন্তু রাণী আবার চোখের উপর ভেসে উঠলে তার সমস্ত সঙ্কল্প, সমস্ত দৃঢ়তা এক নিমিষে ভেঙে-চুরে গুঁড়ো হ'য়ে যেতো। তার উপর সেদিন এম-এ পাস করবার পর শিশিরবাবু তো স্পষ্ট ক'রেই বলেছিলেন, "অরুণ, তোমার মত একটি ব্রাহ্মণের ছেলে পেলে আমি আমার রাণী-মায়ের মন্দিরে আরতি ক'রে দিতুম।"

বিয়ের ক'নে

* *

*

"কি কচ্ছিস রে লক্ষ্মী দিদি ?"

"কে, কেশব-দা ?"

"হাঁ বোন্, একবার এদিকে আয় !"

লক্ষ্মী দৌড়ে গিয়ে সদরের ভাঙা-কবাটটা খুলে দিলে, আর কেশব গল্‌ফ্-কোটের পকেট থেকে কাগজে-মোড়া একটা বই তার হাতের উপর ফেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন, সুখী হয়েছিস্ বোন্ ?"

লক্ষ্মী বইখানা উল্টে-পাল্টে দেখতে-দেখতে একগাল হেসে বললে, "তুমি তো কখন হতভাগী লক্ষ্মীকে তার মত অবস্থার বইগুলো এনে দাওনি কেশব-দা ?"

"অমন অলক্ষণে কথাগুলো বলতে নেই রে পোড়ারমুখি ! আজ তোর কেশব-দা এই ভরসন্ধেবেলায় ব'লে যাচ্ছে—একদিন সংসারের এমন আসনটায় তুই বসবি রে লক্ষ্মী, যেদিন তোর পায়ের তলায় শত ঐশ্বর্য্যময়ীর মাথা আপনা-হ'তে লুটে পড়বে !"

লক্ষ্মীর চোখ বেয়ে হু-হু ক'রে জলের ধারা নেমে এলো। কেশব হাতের মোটটা মাটির উপর রেখে, আপনার কোঁচার খুঁটে তার চোখ দুটো মুছিয়ে দিতে-দিতে বললে, "গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী এলুম কেবল কি তোর কান্না দেখতে রে লক্ষ্মি ?"

এমন সময় অবনী কোত্থেকে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কবে এলে কেশব-দা ?"

"এখনও তো বাড়ীতে যাইনি ভাই ! লক্ষ্মীদিদির খবরটা না-নিয়ে কেশবের পা যে ওঠে না রে অবনী !"

অবনী একটু গম্ভীর স্বরে বললে, "আর শুনেছো কেশব-দা, অরুণবাবু ব্রাহ্ম শিশির বাঁড়ুজ্যের ছোট মেয়েকে বিয়ে করেছেন ? আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ আর কোথায় রাখলেন ?"

কেশব কেঁপে উঠলো ; চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, "তবে অতুল দত্তের কথাটা মিথ্যে নয় অবনী—"

তারপর অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সহসা কেশব ব'লে উঠলো, "না-না, অরুণ কি আমাদের এত বড় সর্ব্বনাশ করতে পারে অবনী ?"

অধোবদনে অবনী উত্তর করলে, "আমি কিছুতেই সন্দেহ রাখিনি কেশব-দা !"

খানিকটা ভেবে লক্ষ্মীর মুখের দিকে চেয়ে কেশব বাণবিদ্ধ হরিণের মত ছট্‌ফট্ করতে-করতে বললে, "তাই তোর চোখের জল আজ কিছুতেই শুকোচ্ছে না—নয় রে লক্ষ্মি ? আচ্ছা—"

থেমে-থেমে আবার কেশবের সেই শেলপড়া হৃদয়টা থেকে ঘা খেয়ে একটা কথা বড় তেজে বেরিয়ে পড়লো, "এই জিনিষটার বদলে জগতে কি এমন কিছু নেই, যা' দিলে তোদের চোখের জল মোছানো যায় রে লক্ষ্মি ?"

অবনীর প্রাণটা আগে থেকেই তো একটা মেঘের মত হয়েছিলো,

এখন কেশবের ব্যাথাটার গায়ে লেগে টপ্‌টপ্‌ ক'রে ঝ'রে পড়তে লাগলো আর কেশব পাগলের মত ব'লে গেল, "তুই মনে ক'রে দ্যাখ লক্ষ্মী-দিদি, যার জন্যে তোর আজ বুক ফেটে চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে, তার কাছ থেকে কতটা পেয়েছিস। পোড়া দেশটা যখন তোদের মতন হতভাগীদের জন্যে এতটুকুও স্থান রাখেনা, তখন কেন বলতো বোন্‌, কেবল রামায়ণ-মহাভারতের দোহাই দিয়ে ওদের অতটা দাবি সহ্য ক'রে যাবি ? ওরা যেমন তোদের কথায়-কথায় হীন—তুচ্ছ ক'রে দেয়, তেমনটা যদি তোরা পারতিস, তাহ'লে এতবড় একটা অনেকদিনের অধিকার হ'তে ওদের এতটুকুও স্বর তুলবার আর ক্ষমতা থাকতো না।"

*

* *

শিক্ষার অভিমানটুকু নিয়ে অরুণ যখন রাণীর হাতটা ধ'রে এতবড় গর্হিত কাজটা ক'রে ফেললে, তখন একটিবার মাত্র বিদ্যুৎ-চম্‌কানোর মত সেই নিরক্ষর পাড়াগাঁয়ে-মেয়েটার কথা তার মনের মধ্যে ধ্বক্‌ ক'রে জ্বলে উঠলো। কিন্তু রাণী যেই তার ইজি-চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে সেক্ষপীয়রের "রোমিও জুলিয়েটে"র কথা তুলে জিজ্ঞাসা ক'রতো, "ওরা কত সুখি ?"

"অত বড় ঐশ্বর্য্যের কথা তুলে আমার স্বপ্নটাকে ভেঙে দিয়ো না রাণি!"

এমনি একটা উত্তর দিতে গিয়ে অরুণের অসীম বুকে লক্ষ্মীর স্মৃতিটুকু প্রায়ই বিশীর্ণ হ'য়ে তলিয়ে যেতো। তবুও সময়ে-সময়ে রাণীর খর-রূপটার তলায় এত স্নিগ্ধ, এত মধুর হ'য়ে দীনবেশে লক্ষ্মী এসে দাঁড়াতো যে, অরুণের খা-খা বুকটা এক নিমিষে শীতল হ'য়ে যেতো।

অরুণের সংসারে কেউ না-থাকলেও জ্ঞাতি-গোত্র যারা ছিলো, শিশির-বাবুর মেয়েটিকে বিবাহ করবার পর থেকেই তারা তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই রাখলেনা। অরুণও বড় গলায় ব'লে দিলে যে, সে জাত-টাতের বড় একটা তোয়াক্কা রাখেনা; তবে সে ন্যায়ের পক্ষপাতী। এইটের উপর দাঁড়িয়ে একদিন সে অন্ধ হিন্দু-সমাজটার চোখ ফুটিয়ে দিয়ে যাবে।

এতদিন অরুণের কোন অভাবই ছিলনা। পশ্চিমে যে জমিদারীটা ছিলো তার আয় থেকেই বেশ স্বচ্ছন্দে সে কলকাতায় কাটিয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু রাণীর খেয়ালের মুখে প্রায়ই সে আজকাল টাকা যুগিয়ে উঠতে পারতো না। দুটো বছর হেসে-খেলে কাটবার পর একটা যেন কেমন অস্বস্তি তাদের দুজনের মনের মধ্যে রত্তি-রত্তি ক'রে বাড়তে লাগলো। রাণী ইভ্‌নিং-পার্টিতে তার বন্ধু-বান্ধবদের যখন নিমন্ত্রণ ক'রে এসে স্বামীর কাছে খরচ চাইতো, তখন মুখটা কালি ক'রে অরুণচন্দ্র উত্তর করতো, "দুটো দিন সবুর কর।"

"সবুর! তাদের ইন্‌ভাইট্‌ ক'রে এসেছি—এতবড় নির্ব্বোধের মত কথা তোমার মুখেই সাজে।"

"কি করবো—উপায় নেই।"

এই কথার পর রাণী প্রায়ই কোচ্ম্যানকে গাড়ী জুত্তে ব'লে বাপের বাড়ী যাবার উদ্যোগ করতো। অরুণ তখন নিরুপায় হ'য়ে—সমাজে আপনার নামটুকু খারাপ হবার ভয়ে রাণীর সমস্ত দাবিটাই স্বীকার ক'রে নিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনতো। কিন্তু এই টাকাটা যোগাড় করতে তাকে মহলের পর মহল বন্ধক দিতে হ'তো।

*

* *

কলকাতার বাড়ীখানা বিক্রি ক'রে অরুণ যখন সামান্য একখানা বাড়ী ভাড়া ক'রে রইলো, তখন রাণীর কথাগুলো যেন তীরের মত তার বুকটায় গিয়ে বিঁধতো। তার উপর অভাবের তাড়নায় যখনই সে কোনো একটা চাকরির জন্য দরখাস্ত লিখতে বসতো, অমনি তার মনে হ'তো—আজ সত্তরটি টাকার জন্যে যেখানে সে মাথা নীচু করতে যাচ্ছে, একদিন সেখানে তাঁদের বড়বাবুকেই সে ব'লে এসেছে, "বড়বাবুই হোন আর যাই হোন, চাকরি—দাসত্ব করার চেয়ে না-খেয়ে মরাও ভালো।"

সে কোন্ মুখে আবার সেখানে গিয়ে এতবড় হীনতা স্বীকার ক'রে চাকরি নেবে? কাজেই দরখাস্তখানা টুক্রো-টুক্রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে সে কেঁদে ফেলতো। যেন আগে থেকেই আপনার জীবনের সব পথগুলো সে নিজের হাতেই নিষ্ঠুরভাবে বন্ধ ক'রে

দিয়েছে। যাই হোক, এতগুলো কষ্টের মধ্যেও তার সান্ত্বনা ছিলো, 'কল্যাণ'—ছ'মাসের ছেলে। সে ভূমিষ্ঠ হবার আটদিন না-যেতেই রাণী ছেলেটাকে বুকে ক'রে স্বামীর সঙ্গে এ-বাড়ীতে উঠে এসেছিলো। সারা দিন নিস্ফল ঘুরে এসে অরুণ আধ-পয়সার বিস্কুটখানা কল্যাণের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বলতো, "কল্যাণ! তোর বাপের এতটুকু শক্তি নেই রে—এই খেয়েই সন্তুষ্ট হ' বাবা!"

কল্যাণ তখন একগাল হেসে সমস্ত বিস্কুট-টা মুখের মধ্যে পুরে দিতো। তার চোখ মুখ যেন বলতো, "গরীব দুঃখীর-ঘরের সব ছেলে যে এও পায় না বাবা!"

রাণী কিন্তু এগুলো বড় দেখতে পারতো না। অরুণ ছেলের মুখে কিছু দিতে গেলেই সে তা' ছুঁড়ে ফেলে দিতো, বলতো, "বাবা হ'য়ে ছেলের মুখে যা-তা দাও কি ক'রে?"

শিশির বাঁড়ুজ্যে রাঁচিতে হাওয়া বদ্‌লাতে গেছলেন তাই এত দুঃখ কষ্ট স'য়েও রাণী এতদিন স্বামীর বাড়ীতে পড়েছিলো। মেয়ের চিঠি পেয়ে বাপ কলকাতায় পৌছে প্রথমেই, সন্ধ্যেবেলায় অরুণের বাসায় এসে উপস্থিত হলেন।

অরুণের তখন হাড়ভাঙা জ্বর। শিশিরবাবু দরজার বার থেকে বললেন, "আমি তবে এদের নিয়ে যাচ্ছি অরুণ?"

অরুণ চম্‌কে উঠলো, বললে, "আমার যে জ্বর—"

"তা-ব'লে তো তোমার এখানে দুটো প্রাণী না-খেয়ে মারা যেতে পারে না!"

অরুণ চুপ ক'রে রইলো, তখন তার জ্ঞান চৈতন্য ছিলোনা ; চীৎকার ক'রে বললে, "কল্যাণ, তোর ওপর তো ওদের অধিকার নেই রে—তুই তোর বাপকে এমন অবস্থায় ফেলে যাসনি বাবা !"

তার কথায় বিদ্রূপ ক'রে শিশিরবাবুর গাড়ীখানা তখুনি বেরিয়ে গেল।

*

* *

যতীনের মুখে অরুণের দুর্গতির কথাটা শুনে কেশবের আর একবিন্দু রাগ তার উপর রইলোনা। কিন্তু একদিন সে বলেছে, যখন অরুণের অপমানে তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়েছে, তখন অরুণের চোখ ফেটে রক্ত বেরুলেও সে ভ্রূক্ষেপে আনবেনা। একথা বলার পর তো আর খাটো হওয়া চলেনা ? কাজেই কেশবের অন্তরাত্মাটা ভিতরে-ভিতরে যতটাই ছট্‌ফট্ করুক-না-কেন, বাহিরটা কিন্তু একেবারে সে-চিহ্নটা লুকিয়ে ফেলেছে। তারপর একদিন কেশব সন্ধ্যের পর তাড়াতাড়ি মেসে ফিরে এসে যতীনকে বললে, "দিন-কয়েক আমি এখানে থাকবোনা যতীন, বামুনঠাকুরকে আমার চাল নিতে বারণ ক'রো।"

যতীন হেসে তাচ্ছিল্য ক'রে উত্তর দিলে, "ফস্ ক'রে কথাটা বলা যে কতটা আহাম্মুখী কেশব, তা' তুমি এখন বুঝে দেখতে পারো !"

কেশব একটু গম্ভীর হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এ-তুলনাটা কেন তুমি দিচ্ছো যতীন ?"

ঘৃণায় যতীনের মুখটা যেন ভ'রে উঠলো, বললে, "লোকে যেটা রাখতে পারবেনা, সেটা নিয়ে কেন এত গুমোর করে ?"

"ওঃ, তুমি অরুণের কথা তুলচো ?"

"তাই যদি তুলি—সুরেশ তোমায় অরুণের বাসায় উঠতে এই মাত্র দেখে এলো।"

খানিকক্ষণ থেমে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেশব আস্তে-আস্তে বলতে লাগলো, "তোমার যদি আমার লক্ষ্মীদিদির মত একটা বোন্ থাকতো যতীন, তাহ'লে একদিন কেন, অরুণ সাতদিন জুতো মারলেও তার রোগের পাশে তোমায় বসতেই হ'তো—"

কেশবের স্বর ভারী হ'য়ে এলো, বললে, "অরুণ আমার যত বড়ই শত্রু হোক যতীন, কিন্তু লক্ষ্মীদিদির সে সর্ব্বস্ব—হতভাগীর মুখখানা মনে পড়লে, অরুণের অপরাধগুলো তত বড় ব'লে বিবেচনা করতে কেশব মোটেই পারেনা !"

*

*   *

তিনদিনের পর জ্বর বিরামের সঙ্গে-সঙ্গে অরুণের গায়ে কি সব গুটী-গুটী দেখা দিলে। ভোরের বেলা একবার চোখ চাইতেই, অরুণ

কেশবকে শিয়রে দেখে চম্‌কে উঠলো। কেশব সারারাতের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে তা'র গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে জিজ্ঞাসা করলে, "কি কষ্ট হ'চ্চে ভাই ?"

অরুণ থপ্‌ ক'রে উঠে কেশবের পায়ের তলায় মুখ্‌টা গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। কেশব তখন তার মুখটা মুছিয়ে দিতে-দিতে বললে, "আমার বুকটার দুটো দিকই যে তোমরা দু'জনে অধিকার ক'রে ব'সে আছো অরুণ, ওখানে তো তোমার স্থান নয় ভাই !"

"তোমার ঠাণ্ডা পা-দু'টোর তলায় আমায় একটু জুড়োতে দাও কেশব ! শত্রুকে বুক পেতে দিয়ে সত্যিই আজ তুমি আমাকে জয় করেছো—যদি আগে তোমার পায়ের তলার আশ্রয়টুকু এত শীতল ব'লে জানতুম, তাহ'লে আমার মিথ্যে অহঙ্কারটা এতটা বাড়তে পেতোনা।"

"অরুণ, তুমি কি জানবে, কেশবের তুমি কতটা ?"

"সেইজন্যেই এতটা ভার নিয়ে মরবার আগে, দেবতার আশীর্ব্বাদে অরুণ প্রায়শ্চিত্তের সময় পেয়েছে কেশব।"

কেশব তাকে বুকে ক'রে বিছানার উপর শুইয়ে দিলে। সে কিন্তু চীৎকার ক'রে বলতে লাগলো, "আমায় একটু পায়ের-ধুলো দাও কেশব, আমার বুক্‌টা যে জ্ব'লে-পুড়ে গেল !"

চার-পাঁচটা দিনের পর অরুণের মুখ দিয়ে কেমন সব অসঙ্গত কথা বেরুতে লাগলো। কেশব দিন-রাত তার পাশে ব'সে এই সব দেখে-দেখে ক্রমেই যেন ম্লান হ'য়ে যাচ্ছিলো। তার উপর নিমাই কবিরাজ যখন ব'লে গেল, "খাঁচাটার আর যত্ন ক'রে কি হবে কেশববাবু ?"

তখন কেশবের মাথার উপর যেন সহসা বজ্রপাত হ'লো।

দুপুরবেলা কেশব কি-একটা প্রলেপ অরুণের গায়ে মাখিয়ে দিচ্ছিলো, এমন সময় দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কে যেন ডাকলে, "কেশব-দা!"

"কে রে, লক্ষ্মীদিদি? আয় রে—"

লক্ষ্মী একটু ঘোমটা টেনে দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত হ'লো।

"কাকে দেখে ঘোমটা দিচ্ছিস রে—"

কেশব চোখে কাপড় দিয়ে হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে ফেললে, বললে, "রক্ষে করতে পারলুমনা রে লক্ষ্মীদিদি, তোর সিঁদুরটা রক্ষে করতে পারলুমনা। তোর জিনিষ এতদিন বুকে ক'রে রেখেছিলুম, এখন যে ক-মিনিট আছে তুই তোর গচ্ছিত সম্পত্তিটা আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নে বোন্—আমার বুকটা হাল্কা হোক!"

লক্ষ্মীর চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ ক'রে জল পড়তে লাগলো। কেশব তার চোখ দুটো মুছিয়ে দিয়ে, হাতটা ধ'রে অরুণের পাশে বসিয়ে দিলে; উপর দিকে চেয়ে ভেবে-ভেবে বলতে লাগলো, "হয় না রে লক্ষ্মী-দিদি—পারিসনা? মৃত্যুর ওপর হাত নেই বুঝি, না?"

"কেশব-দা?"

"কি বোন্—"

"আমি এখুনি ষষ্টিতলায় শীতলা-মায়ের চান-জল আনতে যাবো।"

"এই রোদ্দুরে পুড়ে এলি, একটু জিরুবি না বোন্? তবে গাড়ী ক'রে দিই—"

"এত বড় সর্ব্বনাশের দিনে আমায় কি গাড়ী চ'ড়তে আছে কেশব-দা ?"

তারপর লক্ষ্মী কেশবের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো, চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো— "ও তোমায় অনেক জ্বালা দিয়েছে কেশব-দা, তুমি ওকে ক্ষমা কর—আশীর্ব্বাদ কর! আমি যে তোমার ভরসা বড্ড করি কেশব-দা! বাবা, দাদা তোমার চিঠি পেয়েও এই অজাতের বাড়ী আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলোনা, কিন্তু আমি কি জাত-টাত বুঝতে পারি কেশব-দা—বামুন-দিদিকে নিয়ে চ'লে এসেছি।"

"তবে ওঠ্ লক্ষ্মী, মায়ের দ্বারে গিয়ে আছ্‌ড়ে প'ড়ে বলগে যা, আমাদের মত হতভাগীর মাথার লাল সিঁদুরটুকুতে অতটা আক্রোশ করিসনি মা!"

লক্ষ্মী ভারি-গলায় বললে, "আমি তোমার কাছে সব রেখে যাচ্চি কেশব-দা!"

কেশব অরুণকে বাতাস করতে-করতে অন্যমনস্কভাবে উত্তর করলে, "বড় দায়ী ক'রে গেলি দিদি।"

*

* *

বেহুলা যেমন লখিন্দরের পচা দেহটা কোলে ক'রে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়েছিলো, লক্ষ্মীও তেমনি মনের কোথাও এতটুকু বিকার না-

রেখে অরুণের দেহটা বুকে ক'রে জড়িয়েছিলো। দুর্জ্জয় বসন্ত রোগটা তখন কলকাতার ঘরে-ঘরে এমন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছিলো যে, কেউ বড় একটা কারো নাছ্‌ মাড়াতো না। সদর-রাস্তার উপর থেকে কোনো একটা অমঙ্গলের শব্দ ভেসে এলে লক্ষ্মীর অন্তরাত্মাটা কেঁপে উঠতো, সে মেজেয়-পাতা ঘটের সামনে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে বলতো, "মাগো, কি কচ্ছিস মা—তোর পৃথিবী যে ওজোড় হ'য়ে গেল মা!"

লক্ষ্মীর কোলে মাথাটা রেখে অরুণ চোখ বুজে পড়েছিলো, আর লক্ষ্মী তার গায়ে একটিও মাছি বসতে দিচ্ছিলোনা। অনেকক্ষণ পরে অরুণ ধীরে-ধীরে ডাকলে, "লক্ষ্মি!"

"বল—"

"আমি কি আর বাঁচবো?"

পাগলিনীর মত লক্ষ্মী অরুণের বুকের উপর প'ড়ে কাঁদতে লাগলো, বললে,"তুমি কি আমার এতটুকু ভালো চিরকালটাই দেখতে পারোনা গা—কি আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছো গো!"

অরুণের বিবশ হাত দুটো লক্ষ্মীর চোখ মুছোতে গিয়ে প'ড়ে গেল। জড়িতস্বরে অরুণ বললে, "তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, না লক্ষ্মি?"

লক্ষ্মী তার পায়ের তলায় আছ্‌ড়ে প'ড়ে পা-দুটো বুকে আঁকড়ে ধ'রে চোখের জল ফেলতে-ফেলতে উত্তর করলে, "তুমি যা' নিয়ে সুখী হও, তাই নিয়ে থাক গো! লক্ষ্মী তোমার দোষগুণ দেখবার কে? সে পায়ের তলার দাসী—তাকে যতটুকু দেবে তাই পেয়ে সে সুখী হ'তে পারবে!"

"দিদি !"

"কে ?"

লক্ষ্মী ব্যস্ত হ'য়ে স্বামীর পায়ের তলা থেকে উঠে এলো, আর কোথা থেকে ছুটে এসে রাণী তারই পায়ের নীচে গড়িয়ে পড়লো, কাঁদতে-কাঁদতে বললে, "আমি কখনও তোমার পা-দুটো ছাড়বোনা দিদি, আমায় একটু স্থান দিতে হবে। আজ তোমায় দেখে বুঝতে পেরেছি দিদি, এমনটি না-হ'লে বুঝি সুখ নেই—শান্তি নেই।"

লক্ষ্মী—লক্ষ্মীর মতই তার হাত দুটো ধ'রে তুলতে-তুলতে বলতে লাগলো, "এ যে অক্ষয় রাজত্ব বোন্! তোমার আমার মত একশো জন এলেও যে এখানে স্থানের অভাব হবেনা দিদি !"

তারপর লক্ষ্মী যখন অতি স্নেহভরে রাণীকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে যাচ্ছিলো, তখন বামুনদিদি এসে লক্ষ্মীকেই ধমকে বলতে লাগলো, "এসব কি অনাচার লক্ষ্মি! জুতো পায়ে দিয়ে ব্রাহ্মর মেয়ে মায়ের ঘটের কাছে দাঁড়িয়েছে, মা কি আর এতটা সইতে পারে ?"

লক্ষ্মীর মুখখানি ভয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল। সে গলায় কাপড় দিয়ে ঘটের সামনে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করলে।

বামুন-দিদির গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো, ভয়ে-ভয়ে বললে, "হিঁদুর ঘরে এসব রোগে একটু বাছ-বিচার করতে হয় বাছা !"

তারপর রাণীর দিকে ফিরে বললে, "সোয়ামীর ওপর যদি এতই দরদ তবে এতদিন কোথায় ছিলে বাছা ?"

রাণী মুখটি নীচু ক'রে অতি বড় অপরাধিনীর মত সে-ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল।

*

* *

মরণের পথ থেকে লক্ষ্মী সাবিত্রীদেবীর মত অরুণকে ফিরিয়ে এনেছে। অরুণ এবার বুঝতে পেরেছে, বাঙ্‌লা দেশের অশিক্ষিতা মেয়েগুলোর অন্তঃকরণে কতটা গভীরতা—কতটা স্বর্গের আলো আছে। তার উপর তার যতটুকু শিক্ষার গর্ব্ব ছিলো, লেক্‌চার দিয়ে, চাঁদা তুলে, দেশের কাজ করছি ব'লে যতটা আত্মগরিমা ছিলো, কেশবের এই নিস্বার্থতার কোলে এমন ক'রে ছোট হ'য়ে ভেঙে পড়লো যে, সে তার জীবনটা খুঁজে এমনতর একটা কাজেরও নিশানা পেলেনা। কেবল পুরাতন খবরের কাগজগুলো উল্টে সে দেখতে পেলে, "Babn Arun Chandra has done a great service to the country"—এইরকম সব মিথ্যে প্রশংসার ঝুড়ি রাশি-রাশি এখানে-সেখানে প'ড়ে রয়েছে।

...... * * * ......

একদিন বিকেলবেলা কেশব অরুণের মত নিয়ে আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ ক'রে এলো।

বিয়ের ক'নে

লক্ষ্মী যখন সংসারের পাট কচ্ছিলো আর বামুন-দিদি দাওয়ায় ব'সে তাকে দু-একটা গৃহস্থালীর কথা শেখাচ্ছিলো, তখন রাণী ছুটে এসে কল্যাণকে লক্ষ্মীর পায়ের উপর শুইয়ে দিয়ে ছল-ছল চোখে বললে, "দিদি, এই ছোট ছেলেটি বোধ হয় এখনও ব্রাহ্ম হয়নি—একে তোমার পায়ের তলায় স্থান দিতে পারোনা ?"

লক্ষ্মীর চোখ দুটো ভ'রে এলো ; সে কল্যাণকে বুকের উপর তুলে নিলে। রাণী মাটির দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "তোমার কল্যাণ তোমার কাছে রইলো দিদি—আমি যাই, আজ হয়তো আমায় দেখলে এ-বাড়ীতে কেউ জলগ্রহণ করবেনা।"

"কেন রে রাণী-দিদি, এমন কি তুই ছোট হ'য়ে গেছিস ?"

এইরকম একটা কথা বলতে-বলতে কেশব ফুলের মালা, ফুলের তোড়া, নূতন কাপড় নিয়ে এসে উপস্থিত হ'লো। রাণীর অভিমান উছলে উঠলো, চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ ক'রে জল পড়তে লাগলো। কেশব তাড়াতাড়ি হাতের জিনিষগুলো দাওয়ার উপর রেখে, রাণীর চোখ দুটো মুছিয়ে দিতে-দিতে বড় গলায় বললে, "তুই ভাবিসনি রাণী-দিদি, কেশবরা আজকের কুলীন নয়। কেউ তোর হাতে না-খায়, আমি আমার ছোট বোন্‌টির হাতে না-খেয়ে তো থাকতে পারবোনা দিদি—"

একটু থেমে কেশব আবার বলতে লাগলো, "যাও বোন্‌, জুতো-টুতো খুলে ফ্যালো। আজ গাঁ-শুদ্ধু নেমন্তন্ন ক'রে এসেছি, যারা তোর হাতে খেতে না-চাইবে তারা আমাদের কুটম্ব নেই রইলো—আপনারটিকে ফেলে দিয়ে মিথ্যে আত্মীয় তো কেশব বাড়াবেনা দিদি ?"

বিয়ের ক'নে

রাণী হাউ-হাউ ক'রে কাঁদতে-কাঁদতে কেশবের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো। কেশব লক্ষ্মীকে উদ্দেশ করে বললে, "নে রে লক্ষ্মি, আমার অভিমানী ছোট-বোন্‌টিকে তোর পাশেই দাঁড়-করিয়ে নে!"

লক্ষ্মী তো আগে হ'তেই প্রস্তুত ছিলো, কেবল বামুন-দিদির ভয়ে এ-কদিন সে সাহস করেনি। সে ছুটে গিয়ে রাণীর ব্যথার বুকখানা আপনার বুকের মধ্যে টেনে নিলে। শিউলিফুলের শিশিরের মত রাণীর যত দুঃখ কষ্ট লক্ষ্মীর বুকেই ঝ'রে পড়লো।

খানিক-পরে একটু হেসে লক্ষ্মী কেশবকে জিজ্ঞাসা করলে, "আজ এতো ফুল কেন কেশব-দা?"

কেশব রেগে উত্তর করলে, "বিয়ের পর তোর কি ফুলশয্যে হয়েছে রে লক্ষ্মি—'বিয়ের ক'নে' এই তো প্রথম শ্বশুরবাড়ী এলি—তোর কেশব-দার অবস্থাটা তুই কি এতই খারাপ ভাবিস লক্ষ্মি, যে, সে 'ভার' পাঠাতে পারেনা ব'লে তোদের একরত্তি দিতেও পারেনা?"

অরুণ একবার ভিতরে এসেছিলো, লক্ষ্মীর দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে সদরের দিকে চ'লে গেল।

...... * * * ......

আত্মীয় স্বজনেরা খাওয়া-দাওয়া ক'রে যখন চ'লে গেল, অবনীর কাঁধে হাত রেখে কেশব দুঃখ ক'রে বললে, "হ্যাঁরে অবনী, তোরা যদি

এমনি ক'রে ভাই-বোন্‌গুলোকে এতটুকু দোষে কেটে-ছেঁটে বাদ দিস, তাহ'লে ভেবে দেখ, মূল গাছটার কতটুকু থাকে !"

একটু ভেবে, কেমন যেন একটা স্বপ্ন দেখতে-দেখতে আবার বলতে লাগলো, "আমি এই রাত্তির-বেলা ব'লে রাখলুম অবনী, যদ্দিন তোরা ওপরটা নিয়ে বিচার করবি, তদ্দিন ভেতরটায় যে বড় জাতটা আছে তার সন্ধানই পাবিনা।"

—

—স্বামীর ঘর

ছোট্ট স্বর্ণ'র মধ্যে যে এতটা শিখা থাকতে পারে সুধীন্দ্র তা' কোনো দিনই জানতোনা। স্নেহ, ঐশ্বর্য্য, বিলাসগুলো আস্বাদান ক'রে, মানুষ যে আপনার তুচ্ছ অধিকারটুকুর জন্যে চোখের পলকে সব-রকম শক্ত শিকল কেটে ছিঁড়ে একবারে উন্মত্ত হ'য়ে যায়, এ-রকম চরিত্রটা সে কেবল একদিন এই বোন্‌টারই মনের একধারে দেখতে পেয়েছিলো। যে ঘরে স্বর্ণকে দেওয়া হয়েছিলো সেটা মনে করলে সত্যই সুধীন্দ্রের উঁচু মাথাটা অভিমানে যেন মাটির কাছে নেমে এসে তারই ধুলোর মধ্যে মিশে যেতে চায়।

সেদিন বিকেলে ভাই তার বোন্‌টিকে কাছে ডেকে এনে, পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে বললে, "তুই তো এখন আর ছোট নেই রে স্বর্ণ, তোর বড়দা'র মাথাটা হেঁট ক'রে সেই বেহেট মাতালটার ঘরে আর তোর যেতে মন সরে ?"

খানিকটা থেমে সুধীন্দ্র আবার বলতে লাগলো, "কই, দেখি দিদি, বেতের ক'গাছা দাগ এখনও মিলিয়েছে কি না ?"

স্বর্ণ লজ্জায় কেঁদে ফেললে আর সুধীন্দ্র ঝিকে ডেকে ব'লে দিলে, "তোদের জামাইবাবুকে বলগে যা রে ঝি, তার মতন কশাইয়ের কাছে সুধীর তার সবেমাত্র একটা বোন্‌কে পাঠিয়ে দিতে পারেনা।"

এই আদেশটা অভিসম্পাতের মত স্বর্ণ'র পাঁজ্‌রা-টা ভেঙে দিয়ে সুধীরের মুখ হ'তে বেরিয়ে পড়লো।

এ-পোড়া দেশের মেয়েগুলো এতটা আহাম্মোক যে, তাদের উপর যারাই অত্যাচার ক'রে যায়, তাদেরই বিরুদ্ধে এতটুকু তারা কোনোদিনই সয়ে যায়নি!

আজকেও তার ব্যতিক্রম হ'লোনা : স্বর্ণ মাটির দিকে চেয়ে ডাকলে, "দাদা!"

"কেন রে স্বর্ণ?"

"ওঁকে আজ ফিরিয়ে দিলে আর কখনো পাঠাবেনা।"

সুধীন্দ্র রেগে চোখ দুটো বার ক'রে উত্তর করলে, "সুধীর মিত্তিরের এমন কোনো অভাব হয়নি যে, তার বোন্‌কে পায়ে ধ'রে সেধে রেখে আসতে হবে।"

গলাটা খুব নীচু ক'রে স্বর্ণ হঠাৎ ব'লে ফেললে, "আমাদের যে একটু ছোটই হ'তে হয় দাদা!"

"কি বললি হতভাগি, দূর হ'।"

স্বর্ণ ছুটে গিয়ে সুধীরের পা-দুটো জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে-কাঁদতে বললে, "হতভাগী স্বর্ণ'র ওপর তুমি তো আজ একটুও রাগ করতে পারোনা দাদা, যেটাকে এখন আমি সব-চাইতে বড় ব'লে মানি সেটা তো তোমারই মুখ থেকে প্রথম বেরিয়েছিলো।"

"তুই দূর হ'য়ে যা' স্বর্ণ, আমি তোর মুখ দেখতে চাইনা।"

ঠিক পাথরের মত কঠিন হ'য়ে সুধীন্দ্র পা-দুটো ছিনিয়ে নিয়ে হন্‌হন্‌ ক'রে চ'লে গেল।

আঘাতটা যখন সহ্যকেও ডিঙিয়ে চ'লে যায়, তখন মনটা প্রায়ই

বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। স্বর্ণ এবার দাঁড়িয়ে উঁচু-গলায় ব'লে ফেললে, "সেই গোলপাতার ঘরখানাই আমার ঢের—তোমার ইমারৎ থাকলে আমার কি দাদা?"

*

* *

আপনার আশ্রয়-খাত্‌টা ছেড়ে দিয়ে, দু-পা এগিয়ে এলে জয় তো তার কোনোমতেই হয়না, উপরন্তু শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ই থাকেনা। ইচ্ছে ক'রে আপনার অবলম্বনটা ছেড়ে দিলে শেল, বাজ, ঝড়-ঝাপ্‌টাগুলো যে একটা তৃণের মত তাকে কুটি-কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারে, এটা কোনদিনই স্বর্ণ মনে করতে পারেনি। মানুষ যেখানটায় মীমাংসা করতে পারেনা, সেখানটায় তার সব চেয়ে বেশী লোভ থাকে। কোনো জায়গায় ধরা না-দিয়ে সেখানটায় সে একেবারে বাঁধা প'ড়ে যায়।

হ'লোও তাই। যেটাকে স্বর্গ ব'লে আজ স্বর্ণ দাদার ঐশ্বর্য্য স্বেচ্ছায় ঠেলে ফেলে দিয়ে এসেছে, সেটার ভিতরে কি আছে জানিনা, বাইরে কিন্তু তীক্ষ্ণ-তীক্ষ্ণ কাঁটারই সারি ছিলো। স্বামীর ভিটেয় পা না-দিতে-দিতেই, বিধবা-ননদ নন্দরাণী চকোর ধ'রে তার বুকটারই কোমল জায়গাটায় কেউটের মত দংশালে—"কি-গো বড়মানুষের বেটি, রাজ্য-

ভায়ের সিংহাসন জুড়ে থাকলেই তো পারতে, এ দীন-দুঃখী ন্যাকড়া-পরা স্বামীর ঘরে কেন ?"

"যেতে দে রে নন্দ, ও আজ ইচ্ছে ক'রে না-এলে, ছোটলোক শালার বাড়ী থেকে ওকে বের করাটা সহজ হ'তো না।"

"ইস্, তুই বলিস কি রে মতি ?"

চোখ টিপে-টিপে নন্দরাণী বলতে লাগলো, "আজ যদি সে থাকতো, তবে সুধ্‌রে-উকীলের ক্ষমতা কি যে, সে তিন মাস আমাদের ঘরের বৌকে আট্‌কে রেখে দেয়—টুঁটি ছিঁড়ে ফেলতো না ? তুই তো জানিস, কলকাতার সব চেয়ে বড় আদালতের সে একজন পুরোতন পেয়াদা ছিলো ?"

এই কথাটায় লজ্জায় মতির ঘাড়্‌টা হেঁট হ'য়ে গেল। সে একবার স্বর্ণ'র দিকে চেয়ে বোন্‌কে লক্ষ্য ক'রে বললে, "তুই বড় বেশী কথা বলিস নন্দ—চেপে যা'।"

নন্দরাণী ভায়ের চেয়ে অনেক বছরের বড় হ'লেও ছেলেবেলার অভ্যেসের দোষে মতি তাকে কোনোদিনই দিদি ব'লে ডাকতে পারতো-না। নদী যেখানটায় বাধা পায়, সেখানটায় ফুলে-ফেঁপে একেবারে শতমুখ হ'য়ে যায়। তাই মতির নিষেধটা নন্দকে একেবারে দুর্নিবার ক'রে তুললে। সে যে-বিষগুলো উদ্গীরণ ক'রে যাচ্ছিলো, প্রায় তার সবগুলোরই ঘ্রাণে স্বর্ণ'র অন্তকরণটা ঝ'রে উঠ্‌ছিলো। হায় রে অদৃষ্ট! একদিন আগুনে পুড়েও এই নারীজাতটা ইন্দ্রের বজ্রের চেয়েও মর্ম্মভেদী এই জিভ্‌টার শাসন থেকে রেহাই পায়নি।

স্বর্ণ'র মাথাটা কেমন ঘুরতে লাগলো, সে মাতালের মত টলতে-টলতে নন্দরাণীর পায়ের উপর আছ্‌ড়ে প'ড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ছোট্ট বুকটা থেকে ব্যথাগুলো কেঁপে-কেঁপে সাড়া দিয়ে উঠলো, "তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুরঝি, চুপ করো, আর আগুনের হল্কা যে সহ্য করতে পারিনা গো!"

নন্দরাণী পা-ছুটো ছিনিয়ে নিয়ে ঘৃণার স্বরে বললে, "কত ঢং-ই জানিস?"

স্বর্ণ উপুড় হ'য়ে মাটিতে মুখ গুঁজে ক্ষীণ-গলায় বললে, "না গো, তুমি এইখানটায় হাত দিয়ে দেখ ঠাকুরঝি, তোমার হাতটাও ঝল্‌সে যাবে।"

*

* *

মতির একটা মুদীখানার দোকান ছিলো। এরই খাতা-পত্তরগুলো হিসেব ক'রে, গন্ত ক'রে সে জীবনটা-ভোর্ কাটিয়ে দিয়ে আসছে। কাজের ফাঁকে একটু সময় পেলে সে ন'টা পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে সাঁ ক'রে একবার শ্রীনিবাস সা'র দোকান থেকে ঘুরে আসতো। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতো, "তোরা কি জানবি রে, এটা যদি না-থাকতো তাহ'লে মতি কোনদিন দম্ ফেটে ম'রে যেতো।"

মতি যে কেন এ-তুঃখটা করতো তা' অনেকেরই জানা ছিলো। তিনটে

উপযুক্ত ভাই যখন কাজের লায়েক হ'য়ে তাকে একটা বছরের মধ্যে মুচ্‌ড়ে ভেঙে দিয়ে চ'লে গেলো, তখন তার সমস্ত শিরগুলো টন্‌টন্ ক'রে উঠলো। তার ওপর স্মৃতিটা এত পাজী, এমন অবাধ্য হ'য়ে দাঁড়ালো যে, এই বিশ্রী ভুলের ওষুধটা তাকে ধরতেই হ'লো। অপরাধ তার যতটাই হোক, কিন্তু এই জিনিষটা খানিকক্ষণ তাকে আপনার ক্রিয়ার দ্বারা আচ্ছন্ন ক'রে রাখতে পারতো।

কাজেই সংসারের উপর মতির ঔদাস্যটা খুবই ছিলো। সংসারের কড়াক্রান্তির হিসেব সে রাখতোনা, যা' করতো নন্দ। নন্দর জন্যেই সে বিয়ে ক'রেছিলো, নন্দর-ই কথায় সেদিন আনতে গেছলো,—নন্দর-ই সুবিধে-অসুবিধের দিকে চেয়ে যেটুকু তার সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ। নন্দ তো বোয়ের সুখ্যাতি কখনো করতোই-না, তবু ও যদি একবার প্রসন্ন হ'তো, তাহ'লে মতি মদ খেয়ে এসে স্বর্ণ'র হাতটা ধ'রে বড় আনন্দে বলতো, "স্বর্ণ, আমার জন্যে তোমায় এতটুকুও ব্যস্ত হ'তে হবেনা। ঐ পাগলীটাকে যদি তুমি সন্তুষ্ট রাখতে পারো, তাহলে মতিলাল একদিন দ'খিন-পাড়ায় বুক বাজিয়ে ব'লে আসবে, কি তোরা কিরাত রায়ের বৌ জগদ্ধাত্রীর কথা তুলছিস, দেখে আয়গে যা'—স্বর্ণপ্রতিমা লক্ষ্মী-ঠাকরুণ হতভাগা মতির ঘরে বিরাজ করছে!"

তখুনি সব শেলগুলো, সব তীরগুলো স্বর্ণ'র বুক থেকে খ'সে এক মুহূর্ত্তে প'ড়ে যেতো। সে স্বামীর হাতটা হাতের ভিতর আঁকড়ে ধ'রে—অন্তরের মধ্যে যিনি আছেন তাঁরই চরণে বুঝি নিবেদন করতো, "অন্তর্য্যামী! তুমিই ব'লে দাও, আর আমার কি চাইবার আছে!"

বিয়ের ক'নে

*

* *

রোজ ভোরবেলা পুকুরে চান না-ক'রে, সংসারের পাট করবার স্বর্ণ'র অধিকার ছিলোনা। মতি কোনোদিন ঘরে আসতো, কোনোদিন দোকানেই প'ড়ে থাকতো। স্বর্ণ যখন বিছানা থেকে উঠতো, তখন সবে দু-একটা তারা আকাশের গায়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

শীত গ্রীষ্ম সমানভাবে ঘরের লক্ষ্মী ঘরের কাজ ক'রে যেতো। খুব বেলা ক'রে নন্দরাণীর ঘুম ভাঙ্‌তো। কিন্তু সেই ঝাপ্‌সা সকালটায় বাসনগুলো মাজার দরুণ যদি কোথাও এতটুকুও ছায়ের দাগ থাকতো, কাচা-কাপড়গুলোর সঙ্গে যদি একটা দু-টো পানা উঠে আসতো তাহ'লে স্বর্ণ'র আর রক্ষে ছিলোনা। প্রথমে তো নন্দরাণী বাসনগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিতো, তার উপর বকুনিটা এমনি বিশ্রী ভাষায়, এমনি শুক্‌নো স্বরে তার নাড়ী-নক্ষত্র ধ'রে টান দিতো যে, বুকের সাতটা পর্দার তলায় যিনি আছেন তিনিও একবার ছ্যাঁৎ ক'রে উঠতেন। স্বর্ণ কেবল আঁচল দিয়ে চোখ ঢেকে বলতো, "ওমা পৃথিবী, তোর বুকে আমায় শুতে দে গো, আমার হাড় ক-খানা জুড়োক্—"

স্বর্ণ'র মানুষের দেহ তো! সে কিছু সমানভাবে রোজই বোঝা ব'য়ে নিয়ে যেতে পারেনা। এই দেহটার ওপর অত্যাচার ক'রে-ক'রে একেই তো সে ভেঙে পড়তে বসেছে, তার উপর অসুখ-অবসাদেও

ছুটি না-দিয়ে তাকে যেন একবারে ষড়যন্ত্র ক'রে মেরে ফেলা হ'চ্ছে। আজ সকালবেলা স্বর্ণ যখন উঠতে গেল তখন তার মাথাটা কেমন ভারি ব'লে বোধ হ'লো। সে একবার হেসে বললে, "ওরে দেহ, এইটুকুর জন্যে তুই আজ যদি কাজ না-করিস, তাহ'লে কত বড় সাজাটা তোকে সইতে হবে একবার ভেবে দ্যাখ। সেদিন যখন অত কঠিন বেদনাটা নিয়ে তুই রোজের কাজ জুগিয়ে গেছিস, তখন এই সামান্যর জন্যে আজকে আমায় অপমান করাসনি রে!"

স্বর্ণ তক্তপোষ থেকে জোর ক'রে উঠতে গিয়ে ঢ'লে মেজের উপর প'ড়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে সে আর-একবার অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে ঘরের খিলটা খুলে ফেললে; কিন্তু এবারে কে যেন তার ঘাড়টা ধ'রে মাটির উপর শুইয়ে দিলে।

স্বর্ণ কখনো জানতো না যে, এই মিথ্যে-দেহটা আবার বিদ্রোহ করতে পারে। কিন্তু আজ যখন সে চাবুকের উপর চাবুক মেরে তাকে এক-পাও হঠাতে পারলেনা, তখন কাজেই তাকে সেই ঠাণ্ডা মেজেটার উপর প'ড়ে থাকতেই হ'লো।

তার সমস্ত দেহটা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিলো, ভিতরের হাড়গুলো পর্য্যন্ত শির্‌শির্‌ ক'রে উঠছিলো।

চারিদিক যখন রোদে গন্‌গন্‌ করছিলো, তখন নন্দরাণীর ঘুম-ভেঙে গেল। সে বাইরে এসে দেখলে, উঠোনে ছড়া পড়েনি, ঝাঁট পড়েনি, সংসার নয়-নত্তুর হ'য়ে রয়েছে।

"হাড়-হাবাতের বেটি গেল কোথা"—বলতে-বলতে বাসি ঝাঁটাটা হাতে

ক'রে নন্দ, বো'য়ের ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত হ'লো। যতটা বিষ স্বরের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া যায় ততটাই মিশিয়ে নন্দরাণী উঁচু গলায় বলতে লাগলো, "বলি ও হা'-ঘরের মেয়ে, সারা-রাতেও কি তোমার আশ মেটেনি? যার খাও তারই অমঙ্গল কর? সংসারের পাটগুলো কি তোমার বাবা এসে ক'রে দিয়ে যাবে?"

স্বর্ণ সবই শুনতে পাচ্ছিলো, কিন্তু আজ যে তার শক্তি নেই, তা' না-হ'লে কি সে তার স্বামীর অমঙ্গল ক'রে এতবেলা পর্য্যন্ত মাটির উপর প'ড়ে থাকতে পারতো?

মুখের কাপড়টা খুলে স্বর্ণ একবার নন্দরাণীর দিকে চাইলে, বুঝিয়ে দিলে—সে তো আর ইচ্ছে ক'রে শুয়ে নেই, তোমরাই দ্যাখো তার দেহটার মধ্যে কি যন্ত্রণা হচ্ছে!

এবার নন্দ গর্জ্জন ক'রে উঠলো—"তবে রে গতরখাকী, দেহ পুঁজি ক'রে প'ড়ে রয়েচো—"

সঙ্গে-সঙ্গে সেই ঝাঁটাটাও দু'বার তার পিঠের উপর প'ড়ে গেল—"আসুক আগে মতি—তারপর বোঝাপড়া।"

"কি রে নন্দ, কি হয়েচে?"

সারারাতের পর জ্ঞাতির একটা মড়া পুড়িয়ে, মাতাল অবস্থায় এই মাত্র মতি ঘরে ফিরে এলো। নন্দ তাকে আগাগোড়া তখন বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিলে। মতি রাগে গম্‌গম্‌ ক'রে নিজের ঘরে এসে স্বর্ণ'র

সামনে দাঁড়িয়ে বললে, "এই, এখুনি এ-ঘর থেকে বেরো বলচি, নইলে এক লাথিতে পাঁজ্‌রা-টা ভেঙ্গে দোবো—"

স্বর্ণ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলো; চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ ক'রে জল পড়ছিলো। সে থপ্‌ ক'রে স্বামীর পা-দু'টো দু-হাতে আঁকড়ে ধরলে, ভারি গলায় অস্পষ্টস্বরে বললে, "আমায় লাথি মারো, ঝাঁ্যাটা মারো,—এ-ঘরটা থেকে বেরিয়ে যেতে ব'লো না গো! এই ঘরটার লোভেই যে আমি সব ত্যাগ ক'রে এসেচি।"

"কি তোমার হয়েচে স্বর্ণ?"

বেহেট মাতাল হ'লেও মতি লোকের ব্যথাটা সহজেই ধ'রে ফেলতে পারতো। সে থপ্‌ ক'রে ব'সে প'ড়ে, স্বর্ণ'র মাথাটা নিজের কোলের উপর তুলে নিলে, তারপর চোখের জল মুছোতে-মুছোতে সহসা ব'লে ফেললে, "ভয় কি রে স্বর্ণ—আমার কোলে তো তোর মাথা রয়েছে রে! উঃ, আগুন!"

"না গো না, ও কিছুনা। তোমার পায়ের ধূলো দিলেই সব সেরে যাবে।"

*

* *

ব্যথাটা তারই বেশী লাগে, যে সেটাকে লুকিয়ে রেখে উপরটায় হেসে বেড়ায়। শোক-দুঃখগুলো যদি সঙ্গে-সঙ্গে চোখ দিয়ে ঝ'রে

প'ড়ে যায়, তাহ'লে দিন-রাত বুকের মাঝে ছোট-বড় পুরাতন স্মৃতিগুলোর আঁচ সইতে হয়না। মানুষ যতই কেন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ক'রে স্নেহ জিনিষটাকে ভিতর থেকে দূর ক'রে দিতে চাক্‌না, ভিতরের ভিতরটা কিন্তু তাকেই চায়—তাকেই খোঁজে। ভুল যে তার এখানেই মস্ত। প্রত্যেক হাড়, রক্ত, শিরার সঙ্গে যে একবারে গুলিয়ে গেছে, তাকে কি আর ছেঁকে, বেছে, ফেলে দেওয়া যায়!

সুধীন্দ্রেরও হয়েছিল তাই। যেদিন তার ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারটাকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে স্বর্ণ এতবড় ত্যাগটা ক'রে ফেললে, সেদিন যেন এক নিমিষে তার সমস্ত তেজটা ম্লান হ'য়ে গেল। কিন্তু মানুষ কথনো কারো কাছে এতটুকু খাটো হ'তে চায়না। প্রাণটা তার কেঁদে-কেঁদে উঠলেও সে মুখটায় জোর ক'রে হাসি এনে রেখেছিলো। সিঁড়ি থেকে নামতেই অনেকদিনের ঝি গোপালের মার চোখে তার চোখ প'ড়ে গেল। ধরা পড়বার ভয়ে সে মিথ্যে হেসে বললে, "সে যে অত বড় তেজ ক'রে চ'লে গেল রে গোপালের মা, তাতে কি সুধীর মিত্তিরকে এতটুকু নড়াতে পেরেচে? মনে ক'রেছিস আমি তার কষ্ট দেখতে পারবোনা, সে না-হ'লে আমার চলবেনা; তোরা দেখতে পাচ্ছিস আমি তো দিব্যি আছি—না?"

এবার সুধীরের স্বরটা যেন কেঁপে উঠলো, সে দৌড়ে সেখান থেকে চ'লে গেল।

স্বর্ণকে কাছে ক'রে নিয়ে না-বসলে, নিজের পাতের মাছের একটা পিঠ তার থালায় না-তুলে দিলে, খেতে-খেতে সাতবার কপালের ঘাম

না-মুছিয়ে দিলে সুধীরের খেয়ে কোনোদিনই তৃপ্তি হ'তোনা। আজ ঝিয়ের সঙ্গে কথা কইতে-কইতে তেমনি একটা কিছু মনে পড়ায় তার চোখ দুটো ঝাপ্সা হ'য়ে এসেছিলো, স্বর কেঁপে উঠেছিলো—ভাতের থালার কাছে বসলেই তার বুকটা বড় কেঁদে উঠতো। কতদিন নামমাত্র মুখে দু'খামোল তুলে সে তরকারির বাটীটা আছ্ড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পড়তো, বলতো, "হতভাগী আর যাই করুক, কিন্তু তোমাকে এমন ক'রে রাঁধবার একদিনও সুযোগ দেয়নি বামুন-ঠাকুর!"

লজ্জায় পাচক ব্রাহ্মণ ম'রে যেতো। ভুল যে তার কোনখানটায় সে ধ'রেই উঠতে পারতোনা।

পাড়ার কেউ স্বর্ণ'র সুখ্যাতি করলে, সুধীরের বুকটা নেচে উঠতো, সে একটা উচ্ছ্বাসের মুখে ব'লে ফেলতো, "সুধীরের বোন্ হ'য়ে সে যদি এইটুকুও না-হ'লো, তাহ'লে আর কি হ'লো সাবু কাকা?"

আজ শনিবার, সকাল-সকাল সুধীর কোর্ট থেকে ফিরে এলো। বাড়ী ঢুকতেই শুনলে, ছ-মাসের পর তার স্ত্রী আজ বাপের বাড়ী থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে।

আপনার ঘরটিতে ব'সে সুধীর একটু জিরুচ্ছে, এমন সময় লতিকা একখানা বই পড়তে-পড়তে সেখানে উপস্থিত হ'লো। মুখখানায় একটা শ্লেষ লুকিয়ে রেখে, বইটার উপর মিথ্যে চোখ দুটো দিয়ে হাসতে-হাসতে স্ত্রী স্বামীকে জিগেস করলে, "এই বইখানায় কি লেখা আছে জানো?—বোন্—বোন্—বোন্! বড় আপনার—"

—সুধীর স্বর্ণ'র প্রতারণাটা এতদিন ধরতে না-পারলেও লতিকা যে

অনেকদিন হ'তে এটা জানতো, এইরকম একটা ভাব দেখিয়ে এবার বইটা বন্ধ ক'রে সে বললে, "আমার ফিরে আসা পর্য্যন্তও বুঝি তর সইলো না ?"

উত্তরে সুধীর রেগে কড়া-কড়া ক'রে শুনিয়ে দিলে, "সে তো আর যার-তার মত স্বামীর অপমান করতে পারেনা !"

যে পাখাটার গর্ব্ব ক'রে অবোধ পাখীর মত লতিকা আজ স্বামীর সামনে দাঁড়িয়েছিলো, এই উত্তরটার বিদ্যুৎ-শিখায় সেটা মুহূর্ত্তে জ্ব'লে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল !

*

* *

মতির কারবার তখন লোকসানের মুখে। তখন তার সময়টার এমনি ফের যে, সে যেটায় হাত দিচ্ছে, সেটায় ষোলো আনা সুফলের আশা থাকলেও, কোথা থেকে কেমন ক'রে যেন মন্দটাই হ'য়ে পড়চে। মহাজনের আড়ৎ থেকে মাল এনে ভুক্তান্ দেবার দিন তার তবিলে শূন্য কড়িটি ভিন্ন আর কিছুই থাকতোনা।

যদিও অতুল আদক পাশে একটা নতুন মুদীখানা খুলেচে, তবুও তার দোকানের খদ্দের-রা তাকে ত্যাগ ক'রে যায়নি।

মানুষের মতিচ্ছন্নটা যে কখন কেমন ক'রে এসে পড়ে তা' কেউ বুঝতে পারেনা। প্রথমে এমনি লোভনীয় হ'য়ে সেটা লোকের চোখের

সামনে এসে দাঁড়ায় যে তাকে বরণ ক'রে নিতেই হয়। তারপর সে রক্তপায়ী জোঁকের মত বুকে ব'সে সমস্ত বুকটারই রক্ত চুষে খায়।

লোভে প'ড়ে মতি যেদিন প্রথম জুয়া খেলতে বসলো—যিনি সব পরীক্ষা করেন, তিনি সেদিন হেসে তার হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিয়ে তার মনটাও পরীক্ষা ক'রে নিলেন। দু-আনা পয়সায় এতবড় লাভ! মতির চোখটা জ্ব'লে উঠলো।

মদের মুখে ঘরে এসে সে আপনার বাহাদুরীটা সকলের কাছে প্রকাশ ক'রে দিলে। নন্দ শুনে এতটা খুসী হলো যে, সে সৌভাগ্যের সঙ্গে এই অলক্ষণটাকে এক আসনে রেখে পূজো করলে। কিন্তু এই কথাটা শোনামাত্রই স্বর্ণ'র মনটা শিউরে উঠলো। সে সেদিন রাত্রে স্বামীর পায়ে ধ'রে মিনতি ক'রলে, "ওগো, তুমি আমার সর্ব্বনাশটা ক'রো না—আমাদের কি কড়ি-চালা সয় গো!"

ওরে হতভাগা, স্বর্ণ যে তোর সুমতি রে! ওর কথা অমান্য করিসনি! জানিসনা, তোদের দেশের একজন অতবড় রাজা এই জুয়া খেলতে গিয়ে কতবড় শিক্ষাই না দিয়ে গেছেন? এই ভারতবর্ষটা সব সইতে পারে কিন্তু লক্ষ্মীর অপমান সে কোনোদিনই সয়নি রে!

মরণটা নিশ্চিত জেনেও অতবড় বুদ্ধিমান রাবণ যখন মৃত্যু-বানটার ধ্বংস না ক'রে তাকেই আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন, তখন মতি তো কোন ছার! স্বর্ণ'র পরামর্শটাকে সে হেসে উড়িয়ে দিয়ে গোপনে মরণ-বানটাই সঞ্চয় ক'রে রাখলে।

প্রথমে দু-চার দিন বেশ লাভ হ'লো, তারপর ক্রমে-ক্রমে জুয়ার লাভ

সমেত তবিলের টাকাটাও খেলার মুখে খেয়ে গেল। মহাজনের ঘরে সে বরাবরই কথাটার ঠিক রেখে এসেছে, তাই শূন্য হাতেও পনেরো দিনের কড়ারে মাল পেতে তার কষ্ট হ'লোনা। কিন্তু এ-রোগটা এমন ছোঁয়াচে যে, খেল্‌বোনা ব'লে প্রতিজ্ঞা করলেও একবার লোকসান তুলবার নাম ক'রে যতক্ষণ না সর্ব্বস্বান্ত হওয়া যায় ততক্ষণ আর কিছুতেই থামা যায়না।

সময়ে টাকা না-দিতে পারায় মহাজনেরা মতির ঘরে মাল বন্ধ ক'রে দিলে। মা-লক্ষ্মী যখন যার প্রতি অ-কৃপা করেন, তখন সে চারদিক দিয়েই যেন কেমন কর্কশ, কেমন কুমতলবী হ'য়ে পড়ে। মহাজনদের উড়িয়ে দিতে গিয়ে, এতবড় সর্ব্বনাশের দিনে সে আবার মামলা-মকর্দ্দমা আরম্ভ করলে; সর্ব্বনাশের উপর আর-এক সর্ব্বনাশকে আহ্বান ক'রে আনলে।

*

* *

"কি দেখে এলি রে গোপালের মা? স্বর্ণ বুঝি এলোনা? আমি তো বলেইছিলুম! হতভাগীর কথা তোরা কেন আমায় বার-বার বলিস? যা'—বাড়ীর মধ্যে যা'।"

সুধীন্দ্র এই ভাবটাকে মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে হেসে-হেসে বলতে লাগলো, "হাঁ, সে বুঝি মনে করেচে, তার দাদাই খোসামোদ

ক'রে তার মত বেইমান-বোন্‌টার মুখ দেখতে চেয়েচে—না? তুই কেন ব'লে এলি না যে, শুধু তোদেরই কান্নাকাটিতে আমি এই মতটা অনিচ্ছা ক'রেই দিয়েছিলুম?"

"দাদাবাবু?"

গোপালের মা চোখে কাপড় দিয়ে হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো। সুধীরের বুকটা ছ্যাং ক'রে উঠলো, বললে, "গোপালের মা, আগে বল, আমার স্বর্ণ ভালো আছে তো?"

ঝি কাঁদতে-কাঁদতে চেঁচিয়ে ব'লে ফেললে, "জামাইবাবুর অবস্থা ভালো নয় দাদাবাবু।"

তারপর গোপালের মা সুধীরের পা-দুটো ধ'রে বললে, "দিদিমণি বড় দুখ্‌খু ক'রে ব'লে দিয়েচে, 'বড়-দা কি আমার এমন বিপদের দিনেও দেখবেনা রে গোপালের মা?'—অত কঠিন হ'য়োনা গো দাদাবাবু, দিদিমণি যে তোমার চোখের তারা ছিলো!"

সুধীর বালকের মত কাঁদতে-কাঁদতে বললে, "তোরা কি বুঝবি রে ঝি, স্বর্ণহারা হ'য়ে আমি কি কষ্টে আছি! আমি যে তার ওপর এতটুকু রাগ করিনি রে!—মতির যদি কিছু হয় তাহ'লে কি আমার স্বর্ণ-দিদি বাঁচবে রে গোপালের মা!"

সুধীন্দ্র কেঁদে-কেঁদে চোখ দুটো ফুলিয়ে ফেললে, তারপর চাকরকে ডেকে বললে, "শীগ্‌গির সব যোগাড় ক'রে নে, আজই আমি স্বর্ণ'র বাড়ী যাবো।"

এমন সময়ে মুহুরী রামরতন ঘোষ কতকগুলো কাগজ-পত্র নিয়ে

তাড়াতাড়ি এসে উপস্থিত হ'লো, বললে, "আজ একবার জেলায় যেতে হবে—পাঁচশো টাকা ফি—কাগজপত্তরগুলো দেখে নিন্।"

সুধীর কাপড় দিয়ে চোখ মুছতে-মুছতে উত্তর করলে, "রামরতন, আর আমার টাকা কি হবে, এই নাও সিন্দুকের চাবি—নোট, কাগজ, টাকা-পয়সা যা' আছে, আগুন ধরিয়ে দাও গে! কার জন্যে আর জেলায় বেরুবো রামরতন? স্বর্ণ-দিদিরই যখন সব পুড়ে যেতে বসেছে, তখন সুধীর আর এ মিথ্যে বিষয়-আসয়গুলো রেখে কি করবে!"

*

*　*

স্বর্ণ—সে যে কত বড় রাজত্ব, মতি এতদিনে তা' বুঝতে পারলে। ব্যবসাদারের বাটখারা নিয়ে সে বরাবরই যতটুকু ওজন ক'রে নিয়েচে, ততটুকুরই কম বই বেশি দেয়নি। কিন্তু আজ স্বর্ণ তাকে শিখিয়ে দিলে, কেমন ক'রে শূন্য জমায় এতবড় রাশি-প্রমাণ খরচ করা যায়। মা-বসুমতীর বুকের উপর কত ব্যথাই না বাজছে, কত নির্দ্দয় পদাঘাতই না লুকিয়ে আছে, কিন্তু এই মাটিটা এতবড় স্নেহ ক'রে পা-দুটোকে আঁকড়ে না-ধ'রে রাখলে, মানুষ কি মাটির উপর পা রাখতে পারতো!

বিশ্ব-সংসারে যখন এতটুকু সহানুভূতি পাবার আর আশা থাকেনা

তখন মানুষ চিরদিন যাকে অনাদর ক'রে আসে তারই বুকের মাঝে তিল পরিমাণ স্থান পাবার জন্যে একবারে লালায়িত হ'য়ে পড়ে। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে শূন্য অহঙ্কারটা এমন ক'রে জেগে থাকে যে, এত বড় জিনিষটাও সে-সময় চোখে পড়েনা। কিন্তু আজ যে মতি একবারে নিঃস্ব। পৃথিবী যে তার উপর বিরূপ, কাজেই স্বর্ণ'র মত ঐশ্বর্য্যময়ীর দ্বারে আজ তাকে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে আসতে হয়েচে, বলতেও হয়েচে—দাও গো দাও! কত দ্বার থেকে আর ফিরে যাবো—সকলেই যখন তাড়িয়ে দিয়েচে, তুমি তখন একটু আশ্রয় দাও!"

স্বর্ণও তার পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদতে-কাঁদতে যেন বলেচে—এ-বেশ যে তোমার দেখতে পারিনা গো! তোমার কিসের অভাব? স্বর্ণ যে তোমারই গো, এ যে তোমারই রাজত্ব, আমার কি অধিকার!

স্বামীর মাথাটা কোলে ক'রে স্বর্ণ আজ ন-টা দিন ব'সে আছে। নন্দ চারটের সময় একবার দরজার সামনে থেকে ডাকলে, "বৌ, যা'হোক দুটি খাবি আয়!"

স্বর্ণ স্বামীর বুকটায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললে, "তুমি যাও ঠাকুরঝি, আমি এ-বেলা কিছু খাবোনা।"

"রোগী নিয়ে প'ড়ে থাকলেই তো হবেনা, নিজেদের দেহটাও তো আছে?"

নন্দরাণী হন্‌হন্ ক'রে চ'লে গেল।

স্বর্ণ উপর দিকে চেয়ে ছল্‌ছল্ চোখে মনে-মনে অন্তর্য্যামীকে তার অতিবড় দুঃখের কথাটা জানিয়ে দিলে।

মতি স্বর্ণ'র হাতটার উপর নিজের হাতটা রেখে আস্তে-আস্তে জিগেস করলে, "তুমি খেতে গেলেনা স্বর্ণ ?"

স্বর্ণ'র মাথাটা নুয়ে মতির কপালের উপর প'ড়ে গেল, চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্ ক'রে জল পড়তে লাগলো, বললে, "স্বর্ণ'র খাওয়া যে তুমিই ঘুচিয়ে দিয়েচো গো—"

স্বর্ণ'র স্বরটা জড়িয়ে যেতে লাগলো, "তোমার এঁটো-পাতের লোভটা হতভাগী স্বর্ণ কোনোদিনই ত্যাগ করতে পারবেনা—আজ ন-দিন যে সে সোয়াদ পাইনি গো, এই দেখনা, খেয়ে আমার পেট ভরেনা।"

মতির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

স্বর্ণ ছুটে এসে তার পা-দুটো বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বেদনার স্বরে বললে, "তুমি যাই মনে কর, স্বর্ণ কিন্তু এতটুকুও মিথ্যে বলচেনা। তুমি শীগ্‌গির ভালো হ'য়ে যাও, আমি যে তোমার পাতের দু'টি পেসাদের বড় কাঙালী গো !"

মতির চোখ বেয়ে হু-হু ক'রে জল পড়ছিলো। সে স্বর্ণ'র চোখ দুটো মুছিয়ে দিতে-দিতে বললে, "বুঝিনি স্বর্ণ ! মাতাল, জুয়াড়ে—কেবল তুচ্ছ জিনিষের সন্ধানেই ফিরেচি, তোমার দাম বুঝিনি ! যাক্, একটা কথা রেখো—রাখবে তো স্বর্ণ ?"

মতি স্বর্ণ'র হাত দু'টো ধ'রে যেমন বলছিলো তেমনি বলতে লাগলো, "তোমার মাথা গুঁজে থাকবার মত এতটুকুও স্থান রাখিনি স্বর্ণ, কিন্তু এই কুঁড়েখানা যদি থাকে চিরকাল এখানেই থেকো—নন্দকে দেখো !"

স্বর্ণ মতির মুখে হাতটা চাপা দিয়ে পাগলিনীর মত একবার চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো, বললে, "তুমি কি বোলচ' গো! আমি তোমার হিসেব-নিকেশ বুঝে নেবার জন্যেই কি এতদিন এ-পৃথিবীতে আছি গা!"

"এ-ঘরে কে আছো, স'রে যাও, মতির নামে ওয়ারেণ্ট আছে।"

স্বর্ণ চম্‌কে উঠলো। মতি মনে-মনে বুঝলে তার জাল খাতা-পত্তর ধরা প'ড়ে গেছে। কিন্তু আজ তার ভয় করবার কিছুই ছিলোনা, এর চাইতেও একটা শক্ত ওয়ারেণ্ট আর-একজন তার নামে আগে থাকতেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আবার বাইরে থেকে তেমনি একটা কথা ভারি রুক্ষভাবে ঘরের মধ্যে ভেসে এলো। স্বর্ণ মতিকে বুকের মধ্যে আঁক্‌ড়ে ধরলে।

মতি স্থির হ'য়ে বললে, "স্বর্ণ, ওরা আমায় ধ'রে নিয়ে যেতে এসেচে, তুমি এ-ঘর থেকে চ'লে যাও।"

"না গো, তোমার বুকের দু'টো দিকেই যে কফ্ বসেচে—"

"স্বর্ণ, জোচ্চোর-বদমাইস যারা, তারা কি তোমাদের মত দেবীর কোলে মাথাটা রেখে মরবারও ছুটি পায়না?"

মতি হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো।

স্বর্ণ তার চোখ দুটো মুছিয়ে দিতে-দিতে বললে, "তুমি যখন আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছো, তখন এমন কেউ নেই যে অভাগিনীর বুক থেকে তার সর্ব্বস্বকে ছিঁড়ে নিয়ে চ'লে যাবে!"

"মতি বাইরে এসো, নইলে বাধ্য হ'য়েই আমাদের ঘরে ঢুকতে হবে।"

মতি স্বর্ণ'র হাতটা নিজের চোখে চাপা দিয়ে আস্তে-আস্তে বললে, "স্বর্ণ, যাও, অনেক পাপ করেচি, আজ আবার আমার সামনে তোমার মত স্বাধ্বীর অপমান হ'লে, সে-পাপের ভার আরও ভারি হ'য়ে পড়বে!"

বাইরের লোকেরা ব'লে উঠলো, "তবে আমাদেরই কষ্ট করতে হ'লো—"

স্বর্ণ চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো, "ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, রক্ষে করো গো, নইলে ও বাঁচবেনা—"

"কিছু ভয় নেই রে স্বর্ণ-দিদি, আমি এসেচি।"

আগন্তুক লোকটি পুলিসের লোকদের বললে, "তোমরা এই চিঠিখানা প'ড়ে ভাখো।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সই দেখে তারা সেলাম ক'রে চ'লে গেল।

"এতদিনে কি স্বর্ণ ব'লে মনে হ'লো বড়-দা! বড় দুঃখ্‌খু রইলো বড়-দা, যে, তোমরা আমার এই ভরাডুবীর দিনে একটু আগে থেকে এসে দেখলেনা।"

সুধীন্দ্রের পায়ের উপর স্বর্ণ আছ্‌ড়ে প'ড়ে গেল। সুধীন্দ্রেরও চোখের জল টপ্‌টপ্‌ ক'রে মাটির উপর পড়তে লাগলো। সে স্বর্ণ'র হাত দু'টো ধ'রে তুলতে-তুলতে বললে, "স্বর্ণ, তুই ভিন্ন এ-পৃথিবীতে আমার আর কে আছে রে! সুধীর তার সর্ব্বস্ব দিতে রাজী আছে, যদি তা'তেও তুই আপনার মাথার মণিটা রক্ষে করতে পারিস!"

...... * * * ......

সুধীন্দ্র অনেক চেষ্টা ক'রেও মতিকে রক্ষে করতে পারলেনা। মতির যা' মহাজনের ঘরে দেনা ছিলো, সুধীন্দ্র তার পাই-ক্রান্তিটি পর্য্যন্ত মিটিয়ে

দিলে। তারপর নন্দরাণীকে বুঝিয়ে সে ঠিক করলে যে, স্বর্ণ আর নন্দ তার কাছে ভিন্ন নয়, তাদের এখানে রেখে সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারবেনা, কাজেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে। এখানকার সঙ্গে আর সম্বন্ধ কি? এগুলো বিক্রি ক'রে কিছু নগদ টাকা হ'লে বিধবাদের বরং কাজে লাগতে পারে।

দু'জনে এইরকম একটা ঠিক ক'রে স্বর্ণ'র কাছে উপস্থিত হ'লো।

স্বর্ণ তখন সন্ধ্যের আলোটা মাথার কাছে জেলে রেখে, মেজের উপর উপুড় হ'য়ে পড়েছিলো।

সুধীন্দ্র ডাকলে, "স্বর্ণ, এখনো কি তোর কান্না শেষ হয়নি রে বোন্? ছিঃ দিদি আমার—ওঠ্!"

স্বর্ণ মুখ তুলে একটিবারও চেয়ে দেখলেনা, শুধু একবার বললে, "তোমরা আমায় জ্বালাতন করতে বারে-বারে এসোনা। এই মাটিটার ওপর শেষদিন তাকে শোয়ানো হয়েছিলো, এরই বুকের ওপর শুয়ে দেখি যদি আমার বুকটা ঠাণ্ডা হয়!"

সুধীন্দ্র অনেক ক'রে বুঝিয়ে বলতে স্বর্ণ একবার উঠে বসলো। এইবার তার মুখটা মুছিয়ে দিয়ে সুধীন্দ্র বললে, "স্বর্ণ, ভালো ক'রে বুঝে দেখো তো দিদি, এখানে কি আর তোমাদের থাকা সাজে?"

স্বর্ণ সহসা সুধীন্দ্রের পায়ের তলায় প'ড়ে গেল, বললে, "এই ঘরটার ওপর তার বড় লোভ ছিলো বড়-দা! সে আজ নেই ব'লে তার কথা তো অমান্য করবার এতটুকু শক্তি স্বর্ণ রাখেনা দাদা!"

সুধীন্দ্র কোনো উত্তর করতে পারলেনা।

নন্দ শুধু রেগে বললে, "কতকাল বাঁচতে হবে, ভাত আসবে কোত্থেকে, শুনি ?"

স্বর্ণ চোখে কাপড় দিয়ে সেই মেজেটার উপর শুয়ে পড়লো, বললে, "তোমরা সবাই যাও গো—স্বর্ণ যে সে হুকুম পায়নি! এই হাড় ক-খানা এ-ঘরের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে না-দিয়ে স্বর্ণ কোথাও যাবেনা এইটুকুই তোমরা জেনে রাখো।

—

—অনির্ব্বান-দীপ

সমস্ত হিন্দুস্থানটাকে তুচ্ছ করিয়া, কোন একটা আশা বুকে লইয়া বাঙলার রাজধানী মুর্শীদাবাদে নবাগত যোধমল আপনার দরিদ্র গৃহস্থের স্থানটুকু বাছিয়া লইয়াছিল। সঙ্গে ছিল মৃত প্রভু সমরসিংহের পত্নী এবং তাহারি একটি পনেরো বছরের মেয়ে। আর যে সঙ্গে আসিয়াছিল সে এ-মেয়েটিরই বাগ্‌দত্ত স্বামী—কেতন।

যোধমল আশা রাখিত, বুদ্ধিমান কেতন এতবড় সহরে আপনার একটা কিছু যোগাড় করিয়া লইতে পারিবে। আর পারে যদি, সে কোন জায়গীরদারের ঘরে লাঠি ধরিয়া নিজের শেষ হাড় ক-খানা ভাগীরথীর জলে মিশাইয়া দিবে।

যেদিন আরাবল্লী-পাহাড়ের উপর হাজার অনুচরের সম্মুখে সর্দ্দার সমরসিংহ নিরাশ্রয় সংসারটার দিকে চাহিয়া তৃপ্তিতে মরিতে পারিতে-ছিলনা, সেদিন এই নিরক্ষর-রাজপুত মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিয়াছিল, "সর্দ্দার! আপনার হাজার সঙ্গীর মধ্যে যোধমলকে অসভ্য গোঁয়ার ব'লে সবাই জেনেছে, কিন্তু সে মা-বহিন্‌কে ত্যাগ করে এ-কথা কেউ শুনেছে?"

এ-কথায় সমস্ত মেবার দেশটা তাহার জয় হইয়া গিয়াছিল। সমর-সিংহ আপনার বর্শাটা তাহারই হাতে তুলিয়া দিয়াছিল।

সৌভাগ্যের ঈর্ষা এমন করিয়া যে যোধমলের শত্রুতা করিবে এ-কথা সে কোনদিনই ভাবিতে পারে নাই। বাপ্পা-হাম্মিরের বংশধরগণ তুচ্ছ একটা সম্মানের জন্য যে আপনাদের মনুষ্যত্বটাকে বলি দিতে পারে, ক্ষীণ বিশ্বাসের মত তাহার হৃদয়ের এক-প্রান্তেও তাহা স্থান পায় নাই। কিন্তু চতুর্দ্দিকে যখন বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিল, তখন সে সাত-বছরের ইলাকে লইয়া একদিন হাজার অনুসঙ্গীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। মনে তাহাদের যাহাই থাকুক, সেদিন প্রভাতে কিন্তু হাজারখানি তরবারিই নূতন সূর্য্যের আলোয় ঝক্ঝক্ করিয়া তাহার প্রভুত্ব ঘোষণা করিয়া দিল। যোধমল আপনার মাথার পাগ্ড়ীটা ইলার মাথায় পরাইয়া দিয়া, সর্দ্দারের প্রদত্ত বর্শাটা সসম্মানে আপনার মস্তকে রাখিয়া বালিকার হাতে তুলিয়া দিল, বলিল, "রাজপুত! তোমরা তো অন্যায়ের অমর্য্যাদা করনি, তোমরা তো আমার পূজা করনি ভাই, করেছো এই বর্শাটার, এই পাগ্ড়ীটার! হয়তো আমি অযোগ্য, এতবড় সম্মানের অধিকারী নই, কিন্তু আজ তোমাদের হাজারখানা তরবারির মধ্যে যার অভিষেক করলুম সে তোমাদেরই সর্দ্দারের রক্ত! আমার ওপর রাগ ক'রে যেন সমরসিংহের কন্যার অবমাননা ক'রো না! দাও ভাই, যোধমলের বুকে তোমাদের তীক্ষ্ণ অসি বসিয়ে দাও, কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, বল, আজ প্রভাতে যে তরবারি উন্মুক্ত করেছো, ইলার ভবিষ্যতে, বিপদে-আপদে সেই তরবারিই তার রক্ষী, তার শুভাশুভের দায়ী?"

যোধমল ভাবিয়াছিল অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে, কিন্তু ইহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সে আগুন অধিকতর জ্বলিয়া উঠিল। রাজপুত ভস্মীভূত হইল,

কামনা-বাসনায় রাজস্থান পুড়িয়া গেল। যোধমল শুধু একবার অদূর পর্ব্বত-শৃঙ্গের দিকে চাহিয়া সজল নয়নে জানাইল, "আরাবল্লী! হতভাগী ইলার মস্তকে তুমি ভেঙে পড়—তুচ্ছ একটা নারীর জন্যে এতবড় একটা জাতির ইতিহাসে কালির দাগ রেখে যেয়ো না!"

*

* *

সারাদিনের পর নিষ্ফল হইয়া কেতন যখন গৃহে ফিরিয়া আসিত, তখন বৃদ্ধ যোধমলের চক্ষুদুটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। শুক্‌নো ভাত মুখে তুলিতে-তুলিতে কেতন নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিত আর অদূরে মায়ের কাছে বসিয়া ইলাও চঞ্চল হইয়া পড়িত।

কেতনের তো চেষ্টার অবধি ছিল না; সহর মুর্সীদাবাদে এমন কোন সেরেস্তা ছিল না, যেখানে সে সামান্য মুহুরী-পদের জন্য একদিনও না-ঘুরিয়া আসিয়াছে। কেতন অদৃষ্টে বিশ্বাস করিত, মানিত এক-দিন না-একদিন তার কপালের কালো মেঘটা কাটিয়া যাইবে, সৌভাগ্য-লক্ষ্মী অঙ্কশায়িনী হইবে, তখন সে ইলার দুঃখ ঘুচাইয়া দিয়া, হিতৈষী বন্ধু যোধমলকে মাথায় করিয়া রাখিবে, সত্যকার একটা শান্তির সংসার সে এমনি করিয়া গড়িয়া তুলিবে।

জ্ঞান হইবার পরদিন হইতে ইলাও এইরকম একটা সুখের

কল্পনা করিয়া আসিতেছে। সে জানিত, কেতন কিছু চিরদিন বসিয়া থাকিবে না, আজ না-হয় কাল সে একটা কাজ পাইবেই পাইবে। তখন সে এই কুটীরখানিতেই একটা ছোট-খাট রাজত্বের সৃষ্টি করিবে; সমস্ত বুকখানা দিয়া স্বামীর অভাব অশান্তিগুলি ঢাকিয়া রাখিবে।

কিন্তু এমনি অদৃষ্টের ফের, কেতন কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আজ তাহারই ঘরে সাঁজের বাতিটি জ্বালিয়া দিয়া ইলা যখন ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন কেতন ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতটি ধরিয়া ফেলিল। আনন্দ তার স্বরে-স্বরে উছলিয়া পড়িতে লাগিল, বলিল, "ইলা, তোমার প্রার্থনা কি নিষ্ফল হয়, আজ আমি একটা কাজ পেয়েছি।"

ইলার বুকখানি নাচিয়া উঠিল, সে উদ্দেশ্যে গৃহদেবীকে প্রণাম করিল।

এবার একটু ভয়ে-ভয়ে কেতন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আমি জানি তুমি আমায় বাধা দেবে না ইলা, নবাব-সরকারে সেরেস্তাদারের পদ নিয়ে আমায় হুগ্‌লীর দপ্তরখানায় থাকতে হবে।"

সহসা পূর্ণিমার চন্দ্র ডুবিয়া গেল, ইলার মুখখানা কালো মেঘ আসিয়া ছাইয়া ফেলিল, হাতের সান্ধ্য-প্রদীপটা অলক্ষ্যে পড়িয়া গেল। কেতন আর কোন কথা তুলিতে সাহস করিল না, কেবল একবার বলিল, "তুমি যদি অসন্তুষ্ট হও, সে যত বড়ই পদ হোক না ইলা, কেতন তা' গ্রহণ করতে যাবে না!"

আকাশের দিকে চাহিয়া এইবার কেতন উন্মাদের মত বলিয়া ফেলিল, "ঐ সান্ধ্য-আকাশকে জিজ্ঞাসা কর ইলা, কেতনের অন্তরের মধ্যে কি দ্বন্দ্ব চলছে !"

ইলার চক্ষু হইতে এক ফোঁটা জল কেতনের হাতের উপর গড়াইয়া পড়িল। কেতন চমকিয়া উঠিল ; অপরাধীর ন্যায় বলিল, "তুমি কাঁদ্ছো ইলা ? না, আর আমি হুগ্লী যেতে চাইবো না।"

চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া ইলা একরূপ স্থির হইয়া কহিল, "না, আমার চোখে আর জল নেই কেতন, এমন অবস্থার দিনে আমি তোমায় হুগলী যেতে বারণ করবো না। সংসারে যাদের একমুঠো চাল নেই, তাদের কি হৃদয় ব'লে কোন পদার্থ আছে ?"

দর্‌দর্‌ করিয়া ইলার চক্ষু দিয়া জলের ধারা নামিয়া পড়িল। কেতন তার মস্তকটি বক্ষের উপর রাখিয়া ব্যথিতের মত বলিল, "ইলা, এ-দিনগুলোরও শেষ আছে।"

*

* *

কেতন বিদায় লইয়া চলিয়া যাইবার সময় ইলার দিকে একবার চাহিল, দেখিল সে মাটির উপর শুইয়া পড়িয়া অঝর-নয়নে কাঁদিতেছে ; ডাকিল, "ইলা, আমি যাবার সময় তুমি একবার দেখবে না ?"

"আমায় কে রাজপুতানার গল্প বলবে কেতন ?"

কেতনের চক্ষুদুটির কোলেও জল টল্‌মল্‌ করিতে লাগিল। বাহির হইতে বরকন্দাজ হাঁকিল, কেতন আর বিলম্ব করিতে পারিল না, বলিল, "ওই তারা নবাবী-পাঞ্জা নিয়ে আমায় ডাকতে এসেছে ইলা—"

কেতনের দিকে চাহিয়া ইলা জড়িতকণ্ঠে বলিল, "হতভাগিনী ইলাকে মনে রেখো।"

"তোমার স্বপ্নও যে আমার সুখ!"

দৃষ্টি নমিত করিয়া কেতন চলিয়া গেল। উন্মাদিনী ইলাও দুই পা অগ্রসর হইল, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে যোধমল ডাকিল, "বহিন্‌?"

"দাদা?"

"ফিরে আয়! রাজপুতের মেয়ে এইটুকু সহ্য করতে পারিস না দিদি?"

ইলা বৃদ্ধের স্নেহ-শীতল অঙ্কে ঢলিয়া পড়িল।

আপনার মর্য্যাদাটাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে রাজপুত-নারী চিরদিন যে দৃঢ়তা, যে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে, ইলার মধ্যেও তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র জীবনটা যাহার সহিত মিলিয়া-মিশিয়া খেলিয়া-হাসিয়া এত বড় হইয়াছে—যে উচ্চ পাহাড় হইতে পাখীর পালক আনিয়া দিয়াছে, ঝর্ণার মুখে বসিয়া তাহাকে জল ছিটাইয়া মারিয়াছে, আপনার গায়ের মির্জাইটা খুলিয়া দূর পাহাড়ে বেড়াইবার কালে শীতের সন্ধ্যায় তাহার অঙ্গে জড়াইয়া দিয়াছে, সে কি ভুলিবার! অতীত জীবনের সব কথাগুলিই আজ তাহার স্মৃতিপথে ভাসিয়া আসিতে

লাগিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল—তাহারই রূপের আগুনে যখন নবীন রাজপুত বীরেরা পতঙ্গের মত পুড়িতে বসিল, তখন একটা জাতির দুর্ব্বলতা বাড়িতে পারে এই ভয়েই ন্যায়বান যোধমল স্বদেশ ছাড়িয়া, স্বজাতি ছাড়িয়া, সোনার রাজপুতনার কাছে বিদায় লইয়া দূর বঙ্গদেশে চলিয়া আসিয়াছে। সে যোধমলকে চিনিত, জানিত এত বড় আত্মীয় এই বিশাল পৃথিবীতে আর একটিও নাই। কিন্তু নারীর মোহ যখন পুরুষের পুরুষত্বটাকে ম্লান করিয়া দিত, তখন সমস্ত নারীজাতিটার উপর তার কেমন একটা অশ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিত। ইলা ইহা বুঝিয়া সঙ্কুচিত হইল; উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠিল, "রাজপুতের মেয়ে মনে ক'রে, মনটাকে তো এখনও রাজপুত করতে পারি নি দাদা!"

*

* *

ইলা যখন মৃন্ময় কলসীটি লইয়া, অম্বর শেঠের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া হীরা-ঝিলে জল আনিতে যাইত, তখন দ্বিতলের একটি গবাক্ষ দিয়া রোজ একজন তাহাকে লক্ষ্য করিত। সে একদিন ঊর্দ্ধে চোখ চাহিতেই চারি চক্ষু মিলিত হইয়া গেল। দৃষ্টি নত করিয়া ইলা অবজ্ঞাভরে বলিল, "এত বড় প্রাসাদটা কি শুধু মাটিরই স্তূপ, প্রাণ ব'লে কি কোন জিনিষ এর মধ্যে নেই!"

তারপর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। যোধমল কত কষ্ট করিয়া তবে

এই সংসারটা বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। যেদিন প্রথম তার মনিবের মেয়ে, মনিবের স্ত্রী অনাহারে কাটাইয়া দিল, সেদিন একটি ভাঙ্গা হাতিয়ার লইয়া সে উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "যোধমলের হাতে হাতিয়ার থাকতে তোমাদের অনাহারে কাটাতে হবে দিদি ?"

ইহার কিছুদিন পরে অম্বর শেঠের বাড়ীতে সে লাঠিয়ালদের সর্দ্দারী পদ পাইল, নূতন প্রভুর পায়ের তলায় শিরটা রাখিয়া কেবল একবার জানাইল, "মুনিব ! যোধমল এই মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে প্রভুর মাথাটা রক্ষা করবে ; মাইনে-পত্তর আমার কি হবে মুনিব ? কেবল আমার ইলা-দিদিকে, আমার মাতাজীকে রক্ষা করবার ভার আপনার !"

অম্বর শেঠের কথায় যোধমল ইলাদের সঙ্গে লইয়া তাহারই প্রাসাদের একপ্রান্তে গৃহ পাতিয়া বসিল। কুটীরখানি ছাড়িয়া যাইবার সময় সে মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া বলিল, "আমার ইলা-দিদিকে তুই অনেকদিন বুকে ক'রে রেখেছিলি মা, যোধমল তোর ধার শুধ্‌তে পারবে না !"

... * * * ...

অদূরে গঙ্গার পার হইতে সানায়ের স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। প্রভাতের দুই একটা পাখী জাগিয়া উঠিয়াছে। যোধমল চাঁদ-কবির বীরগাথাগুলি শয্যায় পড়িয়া গাহিয়া যাইতেছে। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল, প্রভু তাহাকে তলব করিয়াছেন।

অম্বর শেঠ তোষাখানায় বসিয়া রূপার ফর্শীতে মুখ লাগাইয়া ধূম

পান করিতেছিলেন। যোধমল আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল, "হুকুম ?"

প্রভু হাসিয়া একটি রূপার রেকাব ভৃত্যকে তুলিয়া লইতে ইঙ্গিত করিলেন। যোধমল আশ্চর্য্য হইয়া গেল; সসম্ভ্রমে রেকাবটা তিনবার ললাটে স্পর্শ-করতঃ জিজ্ঞাসা করিল, "এত মোহর আমার কিসের পুরস্কার মুনিব ?"

"নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ তোমায় উপঢৌকন দিয়েছেন।"

প্রভুর কথার উপর কথা কহিতে সে কোনদিনই পারে নাই। তথাপি কেমন একটা কৌতূহল জন্মিল, ধীরে-ধীরে বলিল, "নবাব-সাহেবের সঙ্গে বান্দার তো কোনদিনের পরিচয় নেই—"

অম্বর শেঠ হাসিয়া লুটিয়া পড়িলেন; বলিলেন, "সমস্ত মুর্সীদাবাদে তোমার পরিচয় অনেকদিন হ'য়ে গেছে যোধমল—"

যোধমল কিছুই বুঝিতে পারিল না। অম্বর আবার বলিতে লাগিলেন, "ইলার মত সম্পদ যার সঙ্গে থাকে, দুনিয়ার চোখে সে যে আগে পড়ে যোধমল !"

যোধমল কাঁপিয়া উঠিল; ঘৃণায় মুখ আকুঞ্চিত করিল। কোন কথা না-বলিয়া সে সেই পাপগৃহ হইতে চলিয়া আসিতেছিল, অম্বর ডাকিলেন, "তোমার বক্‌সিস্ নিয়ে যাও, ইলাকে—"

যোধমল রাগিয়া ঘৃণাভরে উত্তর করিল, "হুঁসিয়ার মুনিব, একদিনও নিমক্ খেয়েছি তাই, নইলে ইলা-দিদির অসম্মান যোধমল সহ্য করতো না—"

একটু থামিয়া আবার বলিল, "ওই সব সোনার মোহরগুলোর লোভ রাজপুত-জাত কোনদিন করে নি। জানো না মুনিব, রাজস্থানের রেণুতে-রেণুতে শত ঐশ্বর্য্যহীনের কীর্ত্তিকণা মিশিয়ে আছে! এমন বৈভবের যারা আস্বাদন পেয়েছে, তারা সামান্য—"

বাধা দিয়া অম্বর শেঠ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেশ, ইলা তোমার কে ?"

"ইলা ? ইলা আমার সর্ব্বস্ব !"

*

* *

সন্ধ্যার অন্ধকার অম্বর শেঠের প্রাসাদের চারিদিকে ঘনাইয়া আসিয়াছিল। যোধমল দ্বিতলে প্রভুর বিরাম-কক্ষে হাজারী-ঝাড়ের বাতিগুলা একটি-একটি করিয়া জ্বালিয়া দিতেছিল। এমন সময় একটা দমকা বাতাস ছুটিয়া আসিল; যোধমলের হাতের প্রজ্বলিত বাতিটা মর্ম্মর গৃহ-তলে পড়িয়া গেল। সে একবার চমকিত হইল, শুনিতে পাইল, অদূর নদীবক্ষ হইতে একটা ক্ষীণ করুণ স্বর যেন বিশ্বের দ্বারে সাহায্য মাগিয়া মিলাইয়া গেল। যোধমল আত্মহারা হইয়া সম্মুখের অলিন্দায় ছুটিয়া যাইতেছিল, পশ্চাৎ হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, "এত অন্ধকার !"

ভৃত্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রভুকে অভিবাদন করিল, অপরাধীর মত অসমাপ্ত কাজটা শেষ করিতে গৃহমধ্যে চলিয়া গেল।

যোধমল বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। তারপর একটা, দুটো, তিনটে গান গাহিয়া লছমীবাঈ মতির মালা বক্‌সিস্‌ লইয়াছে; অম্বর শেঠ বলিয়াছেন, "হ্যাঁ লছমী, গাইতে পারিস বটে, নইলে কি নবাব এত পেয়ার করেন!"

লছমী সেলাম করিয়া জানাইয়া দিয়াছে যে, সে তাঁহার মর্জ্জী।

নূতন হাব-ভাবে লছমী এবার একটা আরবী-গজল গাহিতেছিল। সাড়েঙ্গদারের হাতের ছড়িটা কাড়িয়া লইয়া অম্বর শেঠ দূরে ফেলিয়া দিলেন। গায়িকা হাসিয়া সেলাম করিল। সাড়েঙ্গী লজ্জা পাইয়া থামিয়া গেল, আর লছমীর মধুর স্বর যেন আরও মধুর হইয়া আকাশের বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল। এমন সময় একজন ছুটিয়া আসিয়া অম্বর শেঠের পা-দু'খানি আঁকড়াইয়া ধরিল। লছমী গান বন্ধ করিল। অম্বর রাগিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যোধমল, জান এটা আমার বিরাম কক্ষ—এখানে হুকুম না-নিয়ে প্রবেশ করলে শাস্তি পেতে হয়?"

"জানি, কিন্তু যোধমলের আজ বিচার করবার সময় নেই—আমার ইলাকে রক্ষা করুন মুনিব!"

যোধমলের চক্ষের জল অম্বরের পায়ের উপর গড়াইয়া পড়িল। ভৃত্য কাতরকণ্ঠে বলিয়া গেল, "আশ্রয় দিয়ে আমাদের ঋণী করেছেন, আজ এ-দুর্দ্দিনে দেখুন—"

অম্বর শেঠ ধমক দিয়া বলিলেন, "রাখ তোমার সৌজন্য, কিছু বলবার থাকে তো বল!"

"মুনিব ! মুনিব !"

যোধমলের স্বর রোধ হইয়া যাইতেছিল—"সুদূর রাজস্থান থেকে নিরাপদ হবার জন্মে, প্রভুপত্নী ও প্রভুকন্যাকে সঙ্গে ক'রে একটা সুশাসিত রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলুম—" বক্তা একটু থামিল, চোখ দিয়া শোক-ব্যথার জল গড়াইয়া পড়িল; আবার বলিতে লাগিল, "কিন্তু আশ্রয়দাতা ! আজ রাজধানী মুর্সীদাবাদের বক্ষে, আপনারই সুরক্ষিত পুরীতে মাকে আমার হত্যা ক'রে অত্যাচারী নবাব ইলা-দিদিকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে, এ-কলঙ্ক আমার নয়, আপনার—শরণাগত আমরা !"

অম্বর শেঠ হাসিয়া অবজ্ঞাভরে উত্তর করিলেন, "এ চুরি নয়, নবাবজাদার অভিরুচি !"

একমুহূর্ত্তে যোধমলের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, শোক-দুঃখের পরিবর্ত্তে ম্লান চক্ষুদুটির কোলে দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল। কেমন যেন একটা কথা সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে দাঁড়াইয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "একটা কথা কি জিজ্ঞাসা করতে পারি মুনিব, নবাবকে এই গরীবের মেয়েটার সন্ধান—"

বাধা দিয়া অম্বর স্বাভাবিকভাবে উত্তর করিল, "এটা আমি নবাবকে উপঢৌকন দিয়েছি !"

একটু হাসিয়া আবার তিনি বলিতে লাগিলেন, "তুমি কি মনে কর যোধমল, ছায়ের মধ্যে জহরৎ লুকিয়ে রাখলে আমার মত মুনিবকে প্রতারিত করা যায় ?"

"তুমি শয়তান !"

যোধমলের মুখ হইতে সহসা এই কথাটা বাহির হইয়া গেল।

অম্বর একবার বংশীধ্বনি করিলেন, পাঁচজন সৈনিক আসিয়া যোধমলের হাতে শৃঙ্খল পরাইয়া দিল।

উন্মত্ত যোধমল লৌহের শিকল দিয়া চক্ষুর জল মুছিতে-মুছিতে, বিষ-দন্তহীন সর্পের ন্যায় একবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "এতবড় অত্যাচারের শাস্তি আমি দিতে পারলুম না ব'লে, তুমি মনে ক'রো না মুনিব—"

"যাও !"

প্রভুর আদেশমাত্রই সৈনিকেরা যোধমলকে লইয়া সেই গৃহ ত্যাগ করিল। দূর হইতে তখনও বন্দীর নিষ্ফল অভিশাপ শক্তিমান শ্রেষ্ঠীর গৃহে ভাসিয়া আসিতেছিল।

*

* *

সুবা বাঙ্‌লার নানাস্থান হইতে আজ নবাব আলীবর্দ্দীর জন্মদিন উপলক্ষে আমীর ওমরাহের সওগাৎ মুর্শীদাবাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কেহ্ পাঠাইয়াছেন গোলকুণ্ডার মূল্যবান মতির একছড়া হার, কোন আমীর-পত্নী স্বহস্তে মখমলের টুপীতে সল্‌মা-চুম্‌কির কাজ করিয়া স্বামীর নামে দিয়াছেন, আর কেহ-কেহ হাতীর দাঁতের ছড়ি, পোখ্‌রাজের অঙ্গুরীয়, রেশমী তাজ প্রভৃতি সসম্মানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহার

উপর বাঙ্‌লার ভূস্বামীদের প্রচুর পরিমাণে নজরানা, অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের ছোট-ছোট সামর্থ্যের দান, আর বাঁদী-বন্দিনীদিগের টুক্‌রা কাগজে শূন্য আনন্দের বাণী—আরবী, পারসী, বাঙ্‌লা ভাষায় লিখিত হইয়া রাশিপ্রমাণ মসনদের নিয়ে পড়িয়া রহিয়াছে।

নবাব সিংহাসনে। সম্মুখে হাজার-হাজার আমন্ত্রিত। ইস্তাম্বুলের খরমুজের সুপেয় সরবৎ মুখে-মুখে ফিরিতেছে। লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আগরার বাঈ গাহিয়া যাইতেছে। হুগলী হইতে সেরেস্তাদার আসিয়া, নবাবের সম্মুখে বসিয়া একটির পর একটি উপহার দেখিয়া বাছিয়া লিখিয়া রাখিতেছে। নবাব ছোট বড় সমস্ত উপঢৌকনই একবার করিয়া স্বহস্তে তুলিয়া লইতেছেন; কোনটার তারিফ্‌ করিতেছেন, কোনটা দেখিয়া হাসিয়া সেরেস্তাদার কেতনরায়কে বলিতেছেন, "রাজা শ্যামসেনের নজর!"

কেতন নবাবের স্বর বুঝিল; সেলাম করিয়া আপনার কাজে মন দিল।

এইবার মুন্সী কাগজের রাশি খুলিয়া একে-একে পাঠ করিয়া নবাবকে শুনাইতে লাগিল। কেহ খোদার কাছে নবাবের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছে, কেহ তাঁহার মঙ্গলের জন্য মস্‌জিদে সপ্তাহকাল খোৎবা পড়িতেছে আর কেহ তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা করিতে গিয়া আপনার দুঃখ জানাইয়াছে।

কতকগুলি বাঙ্‌লা চিঠি কেতনের উপর পড়িবার ভার পড়িল, কেতন সবগুলিই পড়িয়া শুনাইল। কিন্তু একখানা চিঠির অক্ষর দেখিয়া তাহার চক্ষু দুটি যেন ঠিক্‌রাইয়া গেল; স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

নবাব সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "ইঃ! অত বড় উচ্চ সাহস তো কেউ করে নি—আবার একবার পড়।"

"নবাব, অত্যাচারের উপর ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না।"

বন্দিনী—ইলা।

কেতনের কম্পিত হস্ত হইতে চিঠিখানা পড়িয়া গেল। নবাব লক্ষ্য করিয়া হাসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ-বন্দিনি?"

সসম্ভ্রমে কেতন উত্তর করিল, "নবাবের জন্মতিথিতে জায়গীরদার অম্বর শেঠের উপঢৌকন!"

নবাব প্রধান খোজাকে আজ্ঞা করিলেন, "তুমি এই নূতন বন্দিনীকে দরবারে মুহূর্ত্তে হাজির কর।"

কেতন হুগলী হইতে মুর্শীদাবাদে আসিয়াও ইলাদের খবর লইবার অবসর পায় নাই। সে তিনমাস আগে একজন আরিন্দার কাছে শেষ খবর পাইয়াছিল মাত্র। 'এ-ইলা কে?'—তাহার প্রাণের মধ্যে সংশয়ের ঝড় উঠিল। আশার প্রদীপ নিবিয়া গেল। চক্ষের সম্মুখে শৈশবের একখানা সুন্দর সরল মুখ সহসা ভাসিয়া উঠিয়া কেতনকে বড় কাতর করিয়া তুলিল।

একটি মুক্তার ঝালর-বিশিষ্ট তাঞ্জাম হইতে এক অনিন্দ্যসুন্দরী ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা দরবার-মণ্ডপে অবতরণ করিল। প্রধান খোজা ইমাম্-বক্স নবাবকে তস্‌লীম করিয়া—আদেশ পালন করিয়াছে জানাইল। নবাব আলীবর্দ্দী চাহিয়া দেখিলেন, মুগ্ধ হইয়া মনে-মনে বলিলেন, "এ যে রমজানের চাঁদ! আস্‌মান্ ছেড়ে দুনিয়ায় উদয় হয়েছে—"

কেতন লুপ্ত অতীতের আলেখ্যটা একবার চোখের সম্মুখে ধরিল। 'ইলার পরিণাম এই !'—অন্যের অলক্ষ্যে তাহার গণ্ড বাহিয়া দুইটি জলের ধারা গড়াইয়া পড়িল।

নবাব ইলার দিকে চাহিয়া মিথ্যা রোষ দেখাইয়া আদেশ করিলেন, "খাতাঞ্জি, সেই চিঠিখানা কই ?"

কেতন তাড়াতাড়ি আত্মচাঞ্চল্য লুকাইয়া ফেলিল, প্রভুর হস্তে পত্র তুলিয়া দিল।

ইলা মাটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল।

উৎসব যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল। নবাব হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধুবর অম্বর শেঠ তোমার মত সুন্দরীকে উপহার দিয়ে এবার যথেষ্ট প্রশংসা নিয়েছেন, কিন্তু এই চিঠিখানা কি তোমার লেখা ?"

ইলা ঘৃণার সহিত উত্তর করিল, "হ্যাঁ, আমারই।"

"আমি তোমায় মার্জ্জনা করলুম। শাস্তির জন্যে ডেকেছিলুম, কিন্তু তার বদলে এখন মতির মালা পরিয়ে আলীবর্দ্দীর অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিই—"

"রাজপুতের মেয়ে এমন মতির মালা ছিঁড়ে—"

কোষে-কোষে অসি ঝণ্-ঝণাৎ করিয়া উঠিল।

নবাবের মুখ গম্ভীর, বজ্রকঠিনস্বরে আদেশ করিলেন, "কেতনরায়, এই উদ্ধতা নারীর বিবাহ ষাট বছরের বৃদ্ধ-হাজাম কাদের মিঞার সঙ্গে—আজই রাত্রে—তোমার ওপর ভার।"

ইলা চমকিতা হইয়া একবার চাহিয়া দেখিল, করুণকণ্ঠে বলিল, "কেতন, আজ আমার মৃত্যু—"

"কি করবো ইলা, এ যে প্রভুর আদেশ—নবাব আলীবর্দ্দীর আদেশ আমি আমান্য করতে পারি না !"

কেতনের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, তথাপি সে কর্ত্তব্যের অবমাননা করিল না। ইলাকে সঙ্গে লইয়া সে যখন সভাগৃহ ত্যাগ করিতেছিল তখন নবাব মনে-মনে ভাবিলেন—সামান্য সেরেস্তাদারের এতবড় কর্ত্তব্য-জ্ঞান ! তারপর বলিলেন, "শুনে যাও কেতন, এ-রমণী তোমার কে ?"

অশ্রু-প্লাবিত মুখটি নত করিয়া কেতন উত্তর করিল, "কেউ নয়, কেতনের—"

নবাব হাসিয়া উত্তর করিলেন, "লছুমীবাঈ সব খবরই আমায় দিয়েছে কেতন !"

তারপর ইলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ইলা ! আলীবর্দ্দীর অধিকারে নারী-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে ব'লে দূর রাজস্থান থেকে এই মুর্সীদাবাদে এসেছিলে—জেনো মা, বাঙলার নবাবের আর যাই অপবাদ থাকুক, সে দস্যুও নয় অত্যাচারীও নয়, সে কেবল তোমার মত মেয়েদের আশ্রয়দাতা—পিতা।"

*

* *

আজ আহেরিয়া উৎসব। এ-উৎসব বাংলার নয় রাজস্থানের—তথাপি কেতন এই তিথিটি এ-দেশে আসিয়াও প্রতিপালন করিত। কেতনরায় আজ মহেশ্বরের মন্দিরে আশীর্ব্বাদ লইতে আসিয়াছে। দেবালয়ে প্রভাত-সূর্য্যের

আলো পড়িয়াছে। অগুরু-চন্দনের গন্ধ দিকে-দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। সম্মুখে এক পূজার্থিনী বালিকা চক্ষু মুদিয়া ইষ্টদেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে। কেতনের হাতের অর্ঘ্য হাতেই রহিয়া গেল। সে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিল, যেন এই জ্বালাময়ী পৃথিবীতে স্বর্গের করুণা নামিয়া আসিয়াছে। স্বপ্ন তার চোখে মুখে যেন ফুটিয়া উঠিল। কেতন আনন্দে বলিয়া ফেলিল, "ইলা, দেবতা তোমার পূজা গ্রহণ করেছেন!"

দেববাণীর মত কেতনের কথাটা ইলার অন্তরে প্রতিধ্বনিত হইল। সে দেবতা প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কেতন আবেগে বলিয়া উঠিল, "মনে পড়ে ইলা, আজকের মত এমনি প্রভাতে একদিন শতদ্রুর কূলে দাঁড়িয়ে বলেছিলে 'কেতন, চিরদিন কিছু আমরা জগতের দ্বারে ভিক্ষে চাইব না; ঐ শতদ্রুর সঙ্গে আকাশ যেখানে মিশেছে, সেখান থেকে একদিন আমাদেরও আহ্বান আসবে!' আমি বলেছিলুম, সে তো দেবতার আশীর্ব্বাদ!"

কেতন একটু থামিল, সহসা ইলার হাতটা ধরিয়া ফেলিল; উচ্ছ্বাসভরে জিজ্ঞাসা করিল, "বল ইলা, দরিদ্র কেতন আজ তোমাকে একটুও সুখী করতে পেরেছে কি না? মহান নবাব আমাদের যে জায়গীর দিয়েছেন,—একি, তুমি কাঁদছো ইলা?"

ইলার চক্ষু দিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে একবার জড়িতকণ্ঠে বলিল, "কেতন, ইলা অভিশপ্তা!"

"বহিন্!"

কেতন চমকিয়া উঠিল আর যোধমল ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে ইলার

শিরদেশ চুম্বন করিল। অনেকদিনের পর দুঃখিনী ইলা তাহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া, অভিমান-অত্যাচার-দুঃখ-ব্যথাগুলি নীরবে ঢালিয়া দিতে লাগিল। যোধমল ইলার চক্ষু মুছাইতে-মুছাইতে কেতনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কেতন, আজ সুবা-বাঙলার অধীশ্বর তোমার দ্বারে অতিথি!"

কেতন আশ্চর্য্য হইয়া গেল ; একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?"

"নবাব আলবর্দ্দী !"

... * * * ...

শৃঙ্খলাবদ্ধ অম্বর শেঠের দিকে চাহিয়া নবাব ইলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা ! আজ তুমি কেতনরায়ের স্ত্রী—বিবাহিতা। তোমার অবমাননার ভয়ে আলীবর্দ্দী নিজেই তোমার গৃহে দরবার করতে এসেছে।"

সকলেই সসম্ভ্রমে তস্‌লীম করিল। নবাব যেমন বলিতেছিলেন তেমনি বলিতে লাগিলেন, "যে তোমার মত দেবীকে নিজের স্বার্থের জন্যে নবাবকে উপহার দিয়ে মুর্সীদাবাদের সিংহাসনকেও কলঙ্কিত করতে গেছ্‌লো, যে তোমার নিরপরাধিনী মায়ের বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিলো, যে তোমার একমাত্র প্রতিপালক যোধমলকে নির্জ্জন কারাগৃহে বন্দী ক'রে রেখেছিলো, তার শাস্তি—তার মৃত্যু তুমিই নির্ব্বাচন কর মা !"

নবাব নীরব হইলেন। অম্বর শেঠ মাটির দিকে চক্ষু রাখিয়া, আপনার পাপের পরিণামটার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আজ অতীত

জীবনের স্মৃতিগুলি বন্দীকে বড় যন্ত্রণা দিতে লাগিল। ইলার মুখের কথাটি শুনিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন !

নবাব পুনরায় বলিলেন, "যত বড় নিষ্ঠুর শাস্তিই হোক, তুমি বল মা !"

ইলা ধীরে-ধীরে গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর করিল, "নবাব, ক্ষমার চেয়ে শাস্তি নেই, আমি বন্দীকে ক্ষমা করলুম !"

এ-আদেশ সমস্ত সভাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। নবাব আলীবর্দ্দী চমৎকৃত হইয়া গেলেন ; আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "বাঙলার নবাবের ন্যায়-বিচারের অহঙ্কার সত্যই আজ তুই চূর্ণ ক'রে দিলি মা !"

ইলা সেলাম করিল। যোধমল নবাবের ইঙ্গিত পাইয়া অম্বর শেঠের শৃঙ্খল খুলিয়া দিল—অভিবাদন করিল।

অপরাধীর চক্ষে জল। সে ঊর্দ্ধে চাহিয়া উন্মত্তের মত একবার বলিয়া উঠিল, "দেবি ! আজ যে অনুতাপের 'অনির্ব্বান দীপ' আমার হৃদয়ে জ্বেলে দিলে, তার অগ্নিবর্ষি শিস্ প্রতিমুহূর্ত্তে আমায় দগ্ধ করবে—মৃত্যুর চেয়েও এ-সাজা যে আরও কঠিন হ'লো মহীয়সি !"

লজ্জায় ইলার মস্তক আরও নত হইয়া গেল।

—কিরণের মা

কিরণের বয়েস কুড়ি-বাইশ-বছর হ'লেও ছেলে-মানুষের মত অভিমানটা তার কথায়-কথায় উথ্‌লে উঠতো। ভালো মন্দ যে-কোনো কথা, কেউ একটু জোর দিয়ে বললে সে মোটেই সইতে পারতোনা। তার বুকটার মধ্যে আব্‌ছায়ার মত একজনের মুখ দিনরাত ভেসে উঠে, পৃথিবীর আদর যত্নগুলো একেবারে তুচ্ছ ক'রে দিতো।

মা যখন মরে, কিরণ তখন পাঁচ-বছরের। জ্ঞাতি-কুটুম্বেরা হলধরকে বুঝিয়ে দিলে যে, স্ত্রীলোক নাহ'লে সংসারটা গুছিয়ে নিয়ে চলবে কে? কাজেই ছেলের দিকে চেয়ে, বছর না-ফিরতে-ফিরতেই হলধর একজনকে ঘরে নিয়ে এলো।

বিয়ের পরেও পুতুলের পাশে শুয়ে দুর্গা তাদের ছেলের মত ঘুম পাড়িয়েছে। কিন্তু স্বামী যেদিন কিরণকে তার কোলের উপর বসিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমার ঐ মাটির পুতুলগুলোর মাঝখানে আমার কিরণকেও একটু জায়গা দিয়ো দুর্গা!' সেদিন দুর্গা তাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধ'রে মিথ্যে-খেলার পুতুলগুলো নাইবার বেলা ফেলে দিয়ে এলো জলে।

দুর্গা নাইয়ে মুছিয়ে খাইয়ে পাড়ার একজন ছেলের সঙ্গে কিরণকে পাঠশালে পাঠিয়ে দিতো। হলধর তো সকালবেলা ক্ষেতের কাজে চ'লে যেতো, ছেলের খবর সে রাখতো কখন?

দুর্গা অল্পবয়সে মায়ের মত গম্ভীর হ'য়ে ছেলেকে আবার শাসন করতো, কিন্তু দুষ্টু ছেলে মোটেই তাকে ভয় করতোনা।

দুর্গার সাধ হ'তো যেন কিরণ তাকে মা ব'লে ডাকে, কিন্তু সে 'বউ' ভিন্ন আর কিছুই বলতে চাইতোনা।

কিছুদিন পরে দুর্গা একবার কিরণকে নিয়ে বাপের বাড়ী গেল। বড় ভাজ্ শিব-সাধনা নিজের ছেলে-পুলের সঙ্গে কিরণকেও একটা কাঁশিতে ক'রে ভাত দিলে। কিরণ কিন্তু ভাতে হাত দিলেনা, গোঁ-ভরে ব'সে রইলো, তারপর সবাই যখন খেতে আরম্ভ করলে তখন সে ঠোঁটদুটো ফুলিয়ে-ফুলিয়ে কাঁশিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। দুর্গা ছুটে এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে, ভাজ্‌কে মিথ্যে ধম্‌ক দিয়ে বললে, "আমার কিরণকে তোমরা অশ্রদ্ধা ক'রে ভাত দিয়েচো—নয়? মুখে তুলে খাইয়ে না-দিলে—"

বাধা দিয়ে চোখ টিপে-টিপে ভাজ ননদকে উত্তর করলে, "বিষ-গাছের ফল তেঁতো বই মিষ্টি হয়না! এ যে দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা! সতীন-ব্যাটা, কাঁটার কাঁটা—এত কেন?"

চোখের জল চোখে মেরেই দুর্গা কিরণকে বুকে ক'রে নিয়ে একটা ঘরের মধ্যে এসে শুয়ে পড়লো। কিরণ বুকের উপর দাঁড়িয়ে খেলা করতে-করতে, চোখের জল দেখে চেঁচিয়ে উঠলো, ডাকলে, "বউ, কাঁদ্‌ছিস?"

দুর্গা তার পায়ের আঙুলগুলো চুষ্‌তে-চুষ্‌তে বড় দুখ্‌খু ক'রে বললে, "আমাকে কি তুই একদিনও মা ব'লে ডাকবি না-রে কিরণ?"

কিরণ থপ্ ক'রে ব'লে ফেললে, "না।"

দুর্গার চোখ দিয়ে এবার হুহু ক'রে জল পড়তে লাগলো, বললে, "ওরা যে অমন ক'রে যা-তা বলে, তুই কি কারো ছেলের চাইতে কম রে কিরণ? কিরণ তুই আমায় মা ব'লে ডাক একবার, দেখি, তাহ'লে এই দুষ্টু মিথ্যে কথাগুলো মরে কিনা!"

"মা!"

হঠাৎ হাসতে-হাসতে কিরণ ছেলে-খেলার মত এই কথাটা ব'লে ফেললে। দুর্গা তার মাথাটা গালের উপর রেখে ভাঙা-ভাঙা আওয়াজে বলতে লাগলো, "আমি তোর সৎমা হবোনা কিরণ—তুই আমার এই শূন্য নামটা মনে ক'রে যেন ঘেন্না করিসনি বোলচি!"

দুর্গার চোখে জল, মুখে কেমনতর হাসি!

এতবড় কথা কিরণ কি বুঝবে? শুধু এ-কথা উচ্চারণ ক'রে দুর্গারই যতটুকু তৃপ্তি!

*

* *

পাঠশালের পড়াটা শেষ করতেই একদিন সকালবেলা হলধর ছেলেকে ডেকে বললে, "পড়াশোনা যখন শেষ হ'য়ে গেছে তখন কাল থেকে আমার সঙ্গে ক্ষেতে বেরুতে হ'বে।"

বাসি পাট করতে-করতে সে-কথা দুর্গার কাণে গেল। সে গর্জ্জন ক'রে উঠলো, জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েচে?"

"হ'বে আর কি, এই কিরণকে বলচি যে আমাদের যা' চাষ্-আবাদের কাজ আছে সেটা দেখে শুনে—"

"আচ্ছা হ'বে-এখন।"

কিরণ সদরে চ'লে গেল আর হতভম্বের মত হলধর দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে স্ত্রীকে লক্ষ্য ক'রেই একবার ব'লে উঠ্‌লো, "তবে কাল থেকেই তো কিরণ আমার সঙ্গে বেরুবে?"

"হ্যাঁ।"

দুর্গা নিজের কাজ করতে লাগলো।

হলধর বেরিয়ে যাবার সময় ছেলেকে একবার চেঁচিয়ে ব'লে গেল, "মনে থাকে যেন, কাল আর কোন ওজর-আপত্তি খাটবেনা।"

তার পরদিন ভোর-বেলা হলধর যখন বিছানা থেকে উঠলো, কিরণ তখন ভাত খেয়ে আঁচাচ্ছে। হলধর কিছু বুঝতে পারলেনা। দুর্গা রান্নাঘর থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "ক-টাকা তোর চাই রে কিরণ?"

কিরণ ভয়ে উত্তর দিলেনা। দুর্গা এবার রেগে উঠলো, বললে, "পড়াশোনার বিষয়ে তোর যত লজ্জা দেখতে পাচ্চি কিরণ, ভর্ত্তি হওয়া নিয়ে কত তোকে দিতে হবে?"

কিরণ কেঁপে-কেঁপে আস্তে-আস্তে বললে, "তিন টাকার বই, মাইনে এক টাকা—"

হলধর চম্‌কে উঠলো, বললে, "উঃ, তিন টাকা! তিন-টাকার ব'য়ে যে জজ্‌-বেলেষ্টার হওয়া যায়!"

কিরণ লজ্জায় আর সাড়া দিলেনা। এবার দুর্গা হন্‌হন্‌ ক'রে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার গালে একটা চড়িয়ে দিলে, চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বললে, "রাত চারটের সময় উঠে তোমার জন্যে ভাত রাঁধলুম কি শুধু এই করতে?"

কিরণ মাটির দিকে চেয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বললে, "রতিদাদা ছ'টাকা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে বলচে।"

"তাই বলনা!"

দুর্গা বালিসের তলায় আটটা টাকা কিরণের জন্যে যোগাড় ক'রে রেখেছিলো, এখন খুঁজতে গিয়ে না-পেয়ে তার মাথাটা ঘুরে গেল, রুক্ষস্বরে বললে, "আমাদের দুজনের ওপর কি তোমার চিরকালটাই শত্রুতা গা?"

হলধরের গলাও উঁচু হ'য়ে উঠলো, বললে, "আমাকে একটা জিগেস্‌-পত্তর না-ক'রে, কার হুকুমে ছেলেকে ইস্কুলে দেওয়া হ'চ্চে, শুনি?"

দুর্গার তখন দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞান ছিলোনা, উত্তর করলে, "ও-তো আর ক্ষেতের কাজ করতে যাচ্চেনা, তোমাকে—"

"কি? যত বড় মুখ—"

দুর্গা চম্‌কে উঠলো, বুঝতে পারলে, আজকের মত এতবড় রূঢ় কথা কোনোদিনই তার মুখ থেকে বেরোয়নি। সে ছুটে গিয়ে স্বামীর পা-দু'টোর মধ্যে মাথা রেখে কাঁদতে-কাঁদতে বললে, "তুমি আমায় শাস্তি

দাও, নইলে আমার এই জিভ্‌টা এখুনি যে খ'সে যাবে গো! তুমি সাজা না-দিয়ে আমার আস্পর্দ্ধা আর বাড়িয়োনা। একটা কথা রাখো, ওর বড় পড়বার সাধ, তাই আমি কাণের মাকড়ী-দুটো ময়রামাসীর কাছে বন্ধক রেখে টাকা যোগাড় ক'রেছিলুম, দাও—ওর বেলা হ'য়ে যাচ্চে—"

হলধরের চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করতে লাগলো, চাপা-গলায় বললে, "এ-বছর ধান, পাট কিছু হয়নি, গয়না বন্ধক রাখলে আর কি ছাড়াতে পারবো দুর্গা? তার ওপর তোমার যা' ছিলো সবই তো খেয়ে ফেলেচি—"

দুর্গা একবার স্বামীর দিকে চেয়ে উচ্ছ্বাসের ভরে বলতে লাগলো, "সব চেয়ে বড় যা' গয়না সে তো এই আমার হাতে, শত রাণীর সোনার মটুক এই যে আমার সিঁতেয় গো! দাও, কিরণের আমার বেলা হ'য়ে যাচ্চে—ওর যে আবার পড়বার বড় সাধ!"

হলধর কেঁদে ফেললে, টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাগলের মত বলতে লাগলো, "দুর্গার মত সৎমা যাদের ঘরে আছে রে কিরণ, তাদের কতদিনের তপস্যা!"

কিরণ হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো আর দুর্গা দৌড়ে গিয়ে তাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধ'রে চোখের জল মুছিয়ে দিতে-দিতে বললে, "তোর হঠাৎ কি-কথা আজ মনে উঠলো রে কিরণ! আমাকে এতটুকু তফাৎ দেখিসনি বাবা, আমি যে তোর সেই মা রে!"

*

* *

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে, কিরণ একটা পাশ দিয়ে জলপানি পেয়েচে। হলধরের মত না-থাকলেও দুর্গা তাকে জোর ক'রে কলকাতায় পড়বার জন্মে পাঠিয়ে দিয়েচে। কিরণ নিজের খরচ কোনো-রকমে চালিয়ে নিতো। কোনো-কোনো মাসে দুর্গা মুড়ি ভেজে যে দু-একটা টাকা লাভ করতো, কিরণের কষ্ট হ'বে মনে ক'রে গ্রামের কেউ কলকাতায় গেলে তার হাতে পাঠিয়ে দিতো।

একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ায় সাতটা গেরো-বাঁধা দুটো সিকি আর একটা আধুলি জীবন বারুই যখন তার হাতে দিয়ে গেল, তখন সে মেসে পাঁচটা ছেলের সঙ্গে জটলা ক'চ্চে! ময়লা-কানিতে বাঁধা কি যে এলো, তার খানিকটা গবেষণা ক'রে পাশের ছেলেগুলি হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। কিরণ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না-ক'রে সেই ময়লা জিনিষটাই মাথার উপর রাখলে। তখনও সকলের মুখে লুকোনো-হাসি ছিলো। একজন দুষ্টুমি ক'রে জিগেস করলে, "ওতে কি হে কিরণ, পরশমণি নাকি?"

কিরণ ছলছল্ চোখে মাটির দিকে চেয়ে উত্তর করলে, "না ভাই, আমার কষ্ট হবে ব'লে আমার মা মুড়ি ভেজে এ-দু'মাসে যে টাকাটা জমিয়েছিলো, সেইটে পাঠিয়ে দিয়েচে!"

সকলেরই মুখ কালো হ'য়ে গেল। এমন পাষাণভেদী কথাটার পর কেউ কি আর এতটুকু স্বর তুলতে পারে!"

...... * * * ......

আজ গ্রীষ্মের ছুটিতে কিরণ বাড়ী আসবে। দুর্গা সমস্তদিন ধ'রে কতগুলো যে তরকারি রেঁধেচে তা' বলা যায়না। কিরণ যা' ভালোবাসে—কচু-শাক, বিরি-কড়ায়ের ডাল আজ তিনমাস বাদে দুর্গা আবার হাঁড়িতে তুলেচে। মধ্যে স্বামী একদিন সখ্ ক'রে কচুর ডাঁটা তুলে এনেছিলো, সে টান্ মেরে ফেলে দিতে-দিতে আগুন হ'য়ে ব'লেছিলো, "পোড়ার মুখে এসব তুলবো কেমন ক'রে? ছেলে যদ্দিন না ঘরে আসে তদ্দিন এ-সব এনোনা বলচি!"

হলধর কেমন থতমত খেয়ে যেতো, দুর্গাকে বুঝেই উঠতে পারতোনা।

বেলা পাঁচটার সময় বোষ্টমদের একটা ছোট ছেলে এসে ব'লে গেল, "মামীমা, কিরণ-দা এয়েচে।"

দুর্গা নারকেল ভাজ্‌ছিল, ছুটে বাইরে এলো, জিগেস করলে, "কোথায় রে?"

"কেন, তোমার সঙ্গে দেখা করেনি বুঝি?"

আগুনের শিস্ দুর্গার শিরায়-শিরায় জ্বলে উঠলো। সে বুকটায় ছট্‌ফট্ করতে-করতে বললে, "না। কোথায় রে?"

"ওই যে জমিদারদের বাড়ী তাস্ খেলচে।"

"হুঁ !"

দুর্গা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার রান্নাঘরে এসে বসলো। নারকেল-গুলো চোখের সামনে চুঁয়ে পুড়ে জ্ব'লে গেল, একবারও চেয়ে দেখলেনা। একটা বেরাল এসে বাটির মাছ তুলে নিয়ে তারই পেছনে ব'সে সশব্দে খেতে লাগলো, সে কিছুই বললেনা। ক্রমে-ক্রমে অন্ধকার হ'য়ে এলো, সে একা চুপটি ক'রে ব'সে রইলো—সাড়া নেই, শব্দ নেই। একবার উঠে ঘরে-ঘরে সন্ধ্যের বাতিটা জ্বেলে দেবারও উৎসাহ তার নেই আজ।

এমন সময় কে একজন উঠোনে পা দিয়ে ডাকলে, "মা, আমি এসেচি !"

দুর্গা ভিতরে জ্ব'লে পুড়ে থাক্ হ'য়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু এই স্বরটা তার সমস্ত রাগ-অভিমান-প্রতিজ্ঞাকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে একবারে মুগ্ধ ক'রে ফেললে। তবুও তার অভিমানটা বাইরে এত নীরস, এত শুক্‌নো যে, কিরণ তার কৃত্রিমতা ধরতেই পারলেনা।

সে তো না-দেখে থাকতে পারেনা ; একটির পর আর-একটি ডাক পড়তেই তাকে বাইরে ছুটে আসতে হ'লো, কিন্তু কেমন যে একটা কথা সেদিন ফস্ ক'রে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, যার উত্তরে কিরণও ফণা তুলে গর্জ্জন করলে, "জানি তো—তুমি সৎমা !"

কিরণ হন্‌হন্ ক'রে বেরিয়ে চ'লে গেল আর দুর্গা মাটির উপর প'ড়ে অঝর-নয়নে কাঁদতো লাগলো।

*

* *

কিরণ যখন আপনার মামার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লো তখন তার মামা খেতে বসেচে। দূর তো বেশী নয়, আধ-কোশের মধ্যেই। হেসে মামীমা জিগেস করলে, "কিরণ, এতদিনে এ-গরীব মামা-মামীকে কি মনে পড়লো বাবা ?"

কিরণ রেগে জবাব দিলে, "সেই রাক্ষুসী-মাগীটা কি গুণ জানে। আমাকে কারো কাছে কি যেতে দিতো মামীমা ? সব আপনার লোক পর হ'য়ে গেছে।"

মামা এক খামোল্ ভাত মুখে তুলে বিদ্রূপের স্বরে বললে, "কেন, মায়ের চেয়েও যে বেশী মা পেয়েছিলি রে !"

"তুমি দেখে নিয়ো মামাবাবু, আর আমি তোমাদের আশ্রয় ছেড়ে কোথাও যাবোনা। কোথায় যাবো ? মা যখন নেই, সৎ-মা—ওতো শত্রু !"

মামা মাধবচন্দ্র ছেলেবেলা থেকে কিরণের খোঁজ একদিনও নেয়নি, এখন ভাগ্‌নাটি বেশ গুণী হ'য়ে উঠছে দেখে মাঝে একবার তার কাণটাকে ভারি ক'রে দিতে গেছলো, কিন্তু তখন সেটা বিষাক্ত জেনে কিরণ অবজ্ঞায় ঠেলে ফেলে দিয়েছিলো। আজ ততবড় বল কিরণের মোটেই ছিলোনা। দুর্জ্জয় অভিমানটা আজ তাকে এমনি আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে যে, দুর্গাকে চিন্‌বার একটুও উপায় নেই।

মামী যত্ন ক'রে কোলের কাছে ভাত বেড়ে দিলে। কিরণ অহঙ্কারে আসনের উপর গিয়ে বসলো, মনে-মনে একবার বললে, তুমি কি মনে করেছো মা, কিরণের পাতের ওপর তুমি একমুঠো না-বেড়ে দিলে সে খেতে পাবেনা ?"

কিরণ মুখে একটি থামোল্ তুলচে, এমন সময় সাগর দত্তর মেয়ে ছুটে তার সামনে এসে বললে, "কিরণ-দাদা, কাকীমা এয়েচে, তুমি ঘরে চলো।"

কিরণ ভয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। হাত থেকে মুখের ভাত ঝর্‌ঝর্ ক'রে প'ড়ে যেতে লাগলো।

মামী কড়া-আওয়াজে বললে, "বলগে যা' সে ভাত খাচ্চে।"

কিরণ এই কথা শুনে শিউরে উঠলো, কাঁপতে-কাঁপতে বললে, "না রে, কই আমি ভাত খাচ্চি ?"

মামা দাওয়ায় ব'সে তামাক খাচ্ছিলো, ধম্‌ক দিয়ে বললে, "ভাত খাচ্ছিস তা' হয়েচে কি ? ওঁরা বেশী আপনার, না আমাদের—"

এবার খুব স্পষ্ট আওয়াজ বার থেকে শোনা গেলো, দুর্গা সাগর দত্তের মেয়েকে লক্ষ্য ক'রে বলচে, "যোশী তুই বলগে যা' যে, দুর্গা অত মামা-মামী কারোর তোয়াক্কা রাখবেনা, সকলের সামনে কিরণের কাণ্ ধ'রে টেনে নিয়ে আসবে !"

মামা কিরণের দিকে চাইলে। সে আস্তে-আস্তে বললে, "তুমি ক্ষেপেচো মামা ? সাধ্যি কি—আমি যাবোইনা !"

মাধবচন্দ্র এইবার জোর পেয়ে ব'লে দিলে, "পরের ছেলের ওপর

মানুষ এই জোরটা কেন করে—যখন সে কথা না-রাখে তখন তার মুখটা থাকে কোথায় ?"

"কিরণ ?"

"মা !"

দুর্গা ডাকলে। কিরণ আর মুহূর্ত্ত ব'সে থাকতে সাহস করলেনা। মুখের ভাত প'ড়ে রইলো, মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত সে দুর্গার পিছনে-পিছনে চ'লে গেল।

মামী তো অবাক ! গালে হাত দিয়ে একটা বিশ্রী ভঙ্গী ক'রে আপন মনেই বললে, "কেনই বা ঢং করতে আসা— জন-জামাই-ভাগ্‌না, তিন নয় আপনা !"

মাধবচন্দ্রের চোখের সামনে এই মেয়েটার তেজটা তখন দপ্‌দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে-জ্ব'লে উঠছিলো।

*

* *

দুটোর পর তিনটে পাশও হেসে-খেলে কিরণ যখন দিয়ে ফেললে, তখন পাড়ার মুরুব্বিরা হলধরের উলুখড়ের সদরে ব'সে গুড়ুক টানতে-টানতে বললে, "হলধর, এবার তোমার দুখ্‌খু ঘুচলো।"

উত্তরে পাঁচহাতি-কাপড়-পরা হলধর রতন চক্কোত্তীর পায়ের দিকে ডান-হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "ওইটের যদি আশীর্ব্বাদ থাকে বড়দা-

ঠাকুর, আর মা মধুমতী যেমন ক'রে ঢালছেন যদি তেমন ক'রে ঢালেন, তবে কিরণ-ছোঁড়ার পিত্তেস্ আমি একরত্তিও করিনা !"

"এইবার এক-গাল ধূম উদ্গীরণ ক'রে যতীন মুখুজ্যে হেসে জানিয়ে দিলে, "আশীর্ব্বাদ ! তুমি কি বলচো বাবাজি—আমাদের চোদ্দ-ভিটেয় জাগ্রত শালগ্রাম। পূর্ব্বপুরুষ শিবনারায়ণ ন্যায়বাগীশকে ঠাকুর স্বরূপে দেখা দিয়েছিলেন। খেতে-শুতে কেবল তোমারই কথা জানিয়েছি—তুমি এটা মনে রেখো বাবাজি, কিরণের পাশ 'ও-কেবল আমার গৃহ-দেবতার ইচ্ছায় !"

হলধর ধর্ম্মপ্রাণ-হিন্দুর মতই এ-কথাটা বিশ্বাস করলে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এটা'ও সে জানিয়ে দিলে যে, কিরণ আর কি এত করেচে, তার মত বয়েসে সে সাত-চালের ভার নিয়ে দশটা লোকের দু'বেলা শাক-অন্ন জুটিয়েচে, তার উপর আক্রার জন দিয়ে পৈতৃক ভিটেটা একবার আগাগোড়া সারিয়ে নিয়েচে।

যতীন মুখুজ্যে লাফিয়ে ব'লে উঠলো, "তাকি জানিনা বাবাজি ? নেত্যগোপাল-ভায়ার আর কি ছিলো, তুমি যাই ছিলে তাই সাতগাঁয়ে এখনও পাইন-বংশের চিহ্ন দেখা যাচ্চে !"

কথাটা না-জুড়োতে দিয়ে রতন চক্কোত্তি পালা আরম্ভ করলে—"এখন কথা হ'চ্চে কি জান ভায়া, কিরণ আমাদের মুখ রেখেছে—সে থুথ্‌থু ক'রেই পড়ুক আর টিউসনি ক'রেই পড়ুক, পাশ তো তিনটে করেচে, তার তো একটা দাম আছে—"

যতীন মুখুজ্যে মাথা নেড়ে 'সায়' দিয়ে বললে, "তবে আর পাশ করা

কেন—এই সাধন আমার এইট্‌-ক্লাসে পড়ে, এরই মধ্যে দেউল-গ্রামের রায়েরা নগদে-গহনায় ন'শো এক টাকা দিতে চাইচে।"

রতন আবার বলতে লাগলো, "ছেলের বিয়ে তো আমাদের আর না-দিলেই নয়—কি বলো ভায়া ?"

হলধর কোনো কথার জবাব দিলেনা। একটা বেতের মোড়ার উপর এইবার ব'সে পড়লো।

রতন বললে, "আজ-কালকার দিনে মেয়েটিও একটু দেখে-শুনে বেছে নিতে হবে, তার ওপর তুমি যে এতদিন হাল কাঁধে ক'রে রোদ-বরষায় ক্ষেত-খামারে খেটে ম'লে, তারও তো একটা আশা রাখো ?"

করালী ঘটক এতক্ষণ সব শুনে যাচ্ছিলো, এইবার রতন চক্কোত্তির কথার মাঝে ব'লে উঠলো, "তুমি তো জানো বাপ্‌ধন, শিরীষ দত্তের—পেটে ক-অক্ষর নেই ছেলেটাকে গত আষাঢ়ে এই শর্ম্মাই পাঁচটি হাজারে বিক্রি করেচে; কিরণ তো সোনার টুক্‌রো ছেলে—যাকে দোবো সেই লুপে নেবে! তুমি দেখে নিয়ো বাপধন, এবারে আমি যদি তোমার ইমারৎ বানিয়ে না-দিই তো তপস্বী ঘটকের ছেলেই নই!"

করালী ঘটকের মুখ-চোখ দিয়ে বেশ একটা দর্প ফেটে বেরুতে লাগলো। সে হলধরের দিকে চেয়ে জিগেস করলে, "কেমন বাপধন, দয়াল আড্ডির নাত্‌নীটির সঙ্গে কথা পাড়বো ?"

যতীন মুখুজ্যে সহানুভূতি জানিয়ে বললে, "তুমি যাতে দু-পয়সা পাও, এতবড় বেনে-জাতটার মধ্যে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারো, সেইটেই আমাদের বিশেষ চেষ্টা বাবাজী! তারপর তোমার ধর্ম্ম

তোমার কাছে। তোমার ইচ্ছে হয় এই গরীব ব্রাহ্মণের ছেলেটির পৈতে দিয়ে দিয়ো, ষোল-আনার সিদ্ধেশ্বরী-তলাটা বাঁধিয়ে পাঁচজনের আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ো, আর পারো যদি রতন বাবাজীর—আহা! বাস্তুহীন ব্রাহ্মণ, যা' দেবে তা' কি বৃথাই যাবে? না-পারো—আমরা পিত্তেশও করিনা!"

এতগুলো লোক হলধরকে একটা বেলা ধ'রে যেটা বুঝিতে দিতে মুখে ফেনা তুলে ফেললে, তার কতটা যে সে নিতে পেরেচে তা' মোটেই ধরা গেলনা। বেনের ছেলে হ'লে কি হয়, তার মত নির্ব্বোধের তো আর জুটী ছিলনা! সে শুধু হেসে এই কথাটা বললে, "বড়দা-ঠাকুর যখন বলচেন কিরণের আমার দাম হয়েচে, তখন একটু দেখে-শুনে ধান পাটের মত সুবিধের বাজারে তাকে বিক্রি করা যাবে!"

তারপর হো-হো ক'রে হাসি, সে-হাসি আর থাম্‌তে চায়না হলধরের।

*

* *

হলধর এই পণ-নেওয়া জিনিষটাকে বরাবরই ঘেন্না করে, কিন্তু তার 'বড়দা-ঠাকুর' প্রভৃতি পাড়ার পাঁচজন মাতব্বর, যাঁদের চোখের সাম্‌নে সে আজ কতটুকু থেকে কত বড় হয়েচে, যাঁরা তার ভালয় আছে মন্দতেও আছে, তাঁদের কথাতে কি সে অমত করতে পারে? বিশেষতঃ

কিরণের উপরেও তাঁদের যে একটা অধিকার আছে—তাঁদের কারুর ক্ষেতের আলু, কারুর ছেলের পড়া-বই নিয়ে কিরণের বি-এ পাশের শৈশবটা যে গড়া হয়েছিলো, এর উপর তাঁরাই যখন খুড়ো, জ্যাঠা, ঠাকুর-দাদার দাবি নিয়ে তার কিরণের ভবিষ্যতটার বিচার করতে আসে, তখন কি ক'রে সে তাঁদের চেয়ে শতপৈঠে-নীচের নির্বুদ্ধি হ'য়ে আপনার ইচ্ছেটার উপর দাঁড়িয়ে থাকে ? তবে একবার তাকে দুর্গার মতটা নিতে হবে। তারই তো কিরণ, কিরণের ভাবনা তার চেয়ে তো পৃথিবীতে কেউ বেশী ভাবেনা, সে না-দিলে তো কিরণকে কেউ পাবেনা—তাই একবার হলধর দুর্গাকে আজকের বৈঠকখানার কথাটা ব'লে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। হলধরের কথা দুর্গার কাণে গেল কি না কে জানে, সে তখন কিরণের ছেঁড়া-কামিজটায় একটা তালি দিচ্ছিলো, স্বামীর এতবড় উৎসাহ তার লক্ষ্যেই পড়লোনা।

হলধর আবার জিগেস করলে, "আমার কথাটা কি তুমি শুনতে পাচ্চোনা দুর্গা ? রতন চক্কোত্তি—"

দুর্গা রেগে উঠলো, বাধা দিয়ে বললে, "কিরণ আমার শুধু-গায়ে বোসেদের ছেলের সঙ্গে বেড়াতে গেছে, এখন ওসব কথা আমার ভালো লাগেনা! কোনো বামুন-কায়েতের মত নিয়ে দুর্গা তার ছেলের বিয়ে দেবেনা বলগে যাও।"

হলধর মুখটি নীচু ক'রে চ'লে গেল। সে চিরদিনই জানে, দুর্গা বেঁকে দাঁড়ালে কারও দোহাই মানেনা।

তার পরদিন রতন চক্কোত্তি এসে জিগেস করলে, "কেমন, মত তো ?"

হলধর শুকনো মুখে ভয়ে-ভয়ে উত্তর করলে, "তা হয়না বড়দা-ঠাকুর, যার ছেলে তার মত নয়।"

রতন চক্কোত্তি হেসে গড়িয়ে পড়লো, তারপর এমন একটা কথা টক্ ক'রে ব'লে ফেললে, যা' শুনে হলধর জিভ্-কেটে বড় গলা ক'রে বললে, "কিরণ যে তার পেটের ছেলের চেয়ে বেশী, বড়দা-ঠাকুর!"

"আরে তুমি ক্ষেপেচো ভায়া? সৎ-মা যে ভালো হয়, পুরাণ-ইতিহাসে এ-কথার আজ পর্য্যন্ত একটাও নিশানা পেয়েচো?"

হলধর জানে সে মুখ্যু, এসব খবর সে কতটুকু রাখে? তবে রামায়ণটা সে পড়েচে। তার চোখদুটো জ্বলে উঠলো। অন্তরটা থেকে ঠিক্‌রে গর্জ্জে একটা কথা বেরিয়ে পড়লো, "আরে, তোমরা বোঝনা সে কতবড়! আমি তাকে নিয়ে ঘর করি, জানি। কেকয় দেশের রাজার মেয়ে দশরথের রাণীর পাশে দুর্গাকে দাঁড় করিয়ে দিলে, তোমাকেই বলতে হবে বড়দা-ঠাকুর, একটা দিকে দুর্গা তাঁর অনেক ওপরে।"

স্ত্রীর প্রতি এই লোকটার অগাধ বিশ্বাস দেখে রতন চক্কোত্তির মাথা হেঁট হ'য়ে গেল। এমন সময় পাড়ার একটি ছোট ছেলে বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ডাকলে, "কাকাবাবু, কাকীমা ডাকচে।"

হলধর রতন চক্কোত্তিকে বসতে ব'লে ভিতরে এসে দেখলে যে, দীনু দত্তের বিধবা স্ত্রী ছোট ছেলে-দুটি আর বার-তের-বছরের মেয়েটিকে নিয়ে দাওয়ার উপর ব'সে আছে। সে তাদের সামনে এসে দাঁড়াতেই দীনুর স্ত্রী মেয়েটিকে তার পায়ের উপর নুইয়ে দিলে। হলধর এসব কিছু বুঝতে পারলেনা। দুর্গা স্বামীর দিকে চেয়ে বড় কাতর হ'য়ে

বললে, "নাও, অনাদরের শিউলি-ফুলের রাশি তোমার পায়ের ওপর ঝ'রে পড়েচে, তুমি তাকে বুকে ক'রে নিয়ে আমার কিরণের গলায় পরিয়ে দাও!"

হলধর কোনো উত্তর করলেনা। দুর্গা আবার বলতে লাগলো, "এই দুটি ছোট-ছোট ছেলে দু-বেলা পেট ভ'রে খেতে পায়না, এমন সাঁঝের তারার মত মেয়ে শুকিয়ে যাচ্চে, কেউ এদের দেখবার নেই। তুমি নিজে দুঃখী গরীব হ'য়ে দুঃখীদের কষ্ট বুঝচোনা গা? কেমন ক'রে এরা এই মেয়েটিকে পার করবে? ছেলেটিকে পড়িয়েচো, এখন এই হতভাগীর চোখের জল মোছাও! আমাদের ক্ষেত আছে, আবাদ আছে, গতোরে খাটতে পারো—দু'খানা ইটের লোভে এদের পায়ে থেকে ফেলে দেবে? নাও, মাকে আমার কুড়িয়ে নাও!"

দুর্গার চোখ দিয়ে জল পড়ছিলো। হলধরের হৃদয়টাও উছ্‌লে উঠলো, সে মেয়েটির হাত ধ'রে তুলতে-তুলতে বললে, "ওঠ মা, আজ থেকে তুমি আমার—"

এমন সময় বাইরের ঘর থেকে রতন চক্কোত্তি ডাকলে, "বড় দেরি হ'চ্চে ভায়া!"

"যাই!"

চিরদিনই হলধরের মাত্রাজ্ঞান নেই, আজও তার ব্যত্যয় হ'লোনা, সে ছুটে সকলের সামনে এসে একগাল হেসে বললে, "দা-ঠাকুর, দুর্গার ইচ্ছে, দীনুর মেয়ের সঙ্গেই কিরণের আমার বিয়ে দেয়।"

একে-একে এতক্ষণে করালী ঘটক, মুখুজ্যে মশাই সবাই এসে জুটেচে।

সকলেই তার কথাটা শুনে এমন 'টিট্‌কারী' দিয়ে উঠলো যে, হলধর সহ্য করতে পারলেনা, রেগে উঠে বললে, "একজন চাষার ছেলে বি-এ পাশ ক'রে তার জাতের একজনেরও যদি একটু উপকারে আসে, তার চেয়ে সে আর বেশী কি আশা করতে পারে!"

*

* *

দুর্গা যেদিন বরণ ক'রে সেই দুঃখীর মেয়েটিকে ঘরে তুললে, সেদিন একজন সকলের অদৃশ্যে মুচকে হাস্‌লেন। দুর্গা কিন্তু তাকে এতটুকু তফাৎ দেখলোনা। সে জান্‌তো, আজ যাকে সে ঘরে এনেচে, সে যে তার ঘরের লক্ষ্মী—বউ! তার কিরণ আজ বড়টি হয়েচে, তারই বুকের উপর সে একলা এতদিন ছুটে লাফিয়ে বেড়িয়েচে; তবে আজ ফুল চন্দন দিয়ে যাকে সে অভিষেক ক'রে আন্‌লে, সে এসে মঙ্গল-শাঁখটা বাজিয়ে দিয়ে তার কিরণের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হ'বে—আর তার বুক-পোরা স্নেহটা দু'জনে ভাগাভাগি ক'রে নেবে, এটা যে তার অনেকদিনের ইচ্ছে—সাধ!"

ফুলশয্যের পরদিন সকালবেলা দুর্গা কাঠের বাক্সর চাবিটা আপনার আঁচল থেকে খুলে বউএর চেলি-কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিলে, বললে, "এখনও তো ঠাকুর ওঠেনি মা, এই আমার খুঁটের চাবি তোমার খুঁটে বেঁধে দিলুম, আমার কাঠের বাক্স তুমি ছুঁলে যেন সোনা হ'য়ে যায়!"

নতুন-বউ চান ক'রে এসে একবার সেই বাক্সটা খুললে, দেখলে,

তাতে পাঁচ-কড়া কড়ি আর একটা সিঁদুর-মাখানো পয়সা ছাড়া আর কিছুই নেই। সে মুখটাকে বেঁকিয়ে মনে-মনে বললে, "তাই সর্ব্বস্ব আমার জিম্মেয় দেওয়া !"

কিরণ সাতগাঁয়ের ইংরিজী-স্কুলের সব-চেয়ে বড় মাষ্টার হয়েচে। মায়ের আশীর্ব্বাদ নিয়ে প্রথম যেদিন সে কাজে বার হ'লো, সেদিন সাত বাড়ী ভিক্ষে ক'রে এনে দুর্গা মা-মঙ্গলচণ্ডীর পূজো দিয়ে এলো। রাস্তায় একজনকে দেখতে পেয়ে সে ডাকলে, "বিধুর মা ?"

"কি গো বউ ?"

দুর্গা মুখটি নীচু ক'রে চ'লে গেল। হায় রে ! সমস্ত সাতগাঁ সহরটায় কেউ কি তাকে কিরণের মা ব'লে ডাক্‌বেনা ? সে তার জীবনটা খুঁজে দেখতে লাগলো কোন্‌খানটায় তাকে ধরা যায়। ভাবতে-ভাবতে যখন সে বাড়ী এলো, তখন হলধর বউ-রান্না ভাত খেয়ে, মাথায় বীজ-ধানের ধামাটা নিয়ে উঠোনে নেমেচে।

দুর্গার বেশীক্ষণ কিছু মনে থাকতোনা, একটুতেই তার দুখ্‌খুটা যেমন উঠে পড়তো, নামতোও তেমনি শীগ্‌গির্। স্বামীর মাথায় মোট দেখে সে সব ভুলে গেল, হঠাৎ ব'লে ফেললে, "তোমার মাথায় আজও যে সেই পুরোণো ধামাটা দেখচি গা ?"

হলধর উত্তর কর্‌লে, "এগারো-বছর বয়েসে, বাবা এই ধামাটা আমার মাথায় তুলে দিয়ে তাঁর কাঁধটা হাল্কা করেছিলেন। আমার এ মাথার বোঝা কে বইবে, কার মাথায় তুলে দোবো দুর্গা ?"

হলধর দেখতে পেলে, দুর্গার চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ ক'রে জল

পড়চে, জিগেস ক'রলে, "ভিজে-কাপড়ে দাঁড়িয়ে এই দুপুর-বেলাটায় কাঁদ্‌চো কেন দুর্গা, যাও—"

দুর্গা থপ্‌ ক'রে স্বামীর পায়ের তলায় ব'সে প'ড়ে কাঁদতে-কাঁদতে বললে, "মোট বোয়ে-বোয়ে তোমার মাথায় টাক্‌ পড়েচে, একদিন যাতে ওই মোটটা নামাতে পারো, তাই শত দুখ্‌খু স'য়েও দুর্গা তার ছেলেটিকে মানুষ করেচে—নাও, ওই ধামাটা আজ থেকে নামিয়ে রাখো। কিরণ আমার সাতগাঁয়ের ইস্কুলের সব-চেয়ে বড় মাষ্টার হয়েচে, তুমি এখনও কি ধামা মাথায় তুলবে গা? আজ যে আমার সংসারটা 'অন্নপূর্ণার-মন্দির!' আজ কার হাতের ভোগ-রান্না খেলে গো?—আমি মায়ের আঁচলে চাবি বেঁধে দিয়েচি, তুমি তোমার মাথার ধামা কিরণের মাথায় তুলে দাও!"

হলধর ময়লা গামছাটা দিয়ে চোখের দুটো কোণ মুছে ফেললে।

*

* *

আট-দশ-বছরের মধ্যে কিরণ আপনার অবস্থাটা ফিরিয়ে নিয়েচে। যেখানে আগে দু-খানা খ'ড়ো-ঘর ছিলো, সেখানে আজকে চক্‌-মিলোনো বাড়ী, পুকুর, বাগান যেন 'ইন্দ্র-ভুবন' হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। কিন্তু হলধরকে এই সুখের দিনগুলো দেখতে হয়নি, তাকে মাথার বোঝা মাথায় ক'রেই মরতে হয়েচে। সে কিরণ-ছোঁড়ার পিত্তেশ ক'রেনা বলেছিলো, সেই

আড়িটাই রেখে গেল। শ্মশানঘাট থেকে কিরণ যেদিন দুর্গার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে এলো, সেদিন দুর্গা বাঁধের ধারের রাস্তার উপর উপুড় হ'য়ে কাঁদতে-কাঁদতে বললে, "আর আমায় ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাসনি রে কিরণ, তার সঙ্গে আমায় যেতে দে! সে চিরকালটাই খেটে গেছে, তোর একটা মাসের মাইনেও তাকে খেতে হ'লোনা রে! সেদিন যদি তার জিদেই জিদ্ দিয়ে তোকে ক্ষেতের কাজে পাঠাতুম, তাহ'লে আজকে তবু মনটাকে এই ব'লে প্রবোধ দিতে পারতুম যে, তুই তার হাতের কোদাল দিয়ে একটা দিনও কুপিয়েছিস্!"

"তুমিও কি কিরণকে পায়ে ক'রে ঠেলে দিচ্চো মা?"

কিরণের চোখ দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা ক'রে জল পড়তে লাগলো।

তারপর দুর্গা আর একটা দিনও কাঁদেনি। সবদিক্ বুঝে আস্তে-আস্তে সে আজ কিরণকে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু দুর্গা আপনি নেমে এসে যাকে সিংহাসনটায় বসিয়েছিলো, সে আজ তার কোনো মর্য্যাদা রাখলেনা। দুর্গার বুকটা এক-একসময় তার একটা-একটা কথাতে যেন খান্-খান্ হ'য়ে যেতো। ছোট হবার ভয়ে অভিমানিনী দুর্গা বউয়ের এই কথাগুলো কারও কাছে বলতোনা।

তার উপর হলধর মরবার পর কিরণের শাশুড়ী ছেলে দুটিকে নিয়ে এখানে এসেই রয়েচে। বউকে কিছু বলতে গেলে তারা তিনজনে তাকে কত কথাই না শুনিয়ে দিতো। আগে কিরণ খেতে বসলে দুর্গাকে তার সামনে গিয়ে বসতে হ'তো। আজ তার শাশুড়ী তার হাত থেকে এটাও কেড়ে নিয়েচে। কিরণ আগে সন্ধ্যেবেলায় তার

ঘরটিতে এসে, মায়ের কাছে ব'সে কত কথাই না কইতো! আর আজ পাশের ঘরে কিরণ কত লোক নিয়ে গল্প করচে, কত হাসির কথাই না উঠচে, তার কাণে গিয়ে পড়চে, কিন্তু আজ যে সে দরিদ্র—নিজের ঐশ্বর্য্য হারিয়ে, আপনার ঘরের দ্বারে দাঁড়িয়েই সে তার কিরণের একটা কথা শোনবার জন্যে আজ লালায়িত!

দুর্গা অন্ধকার ঘরে শুয়ে-শুয়ে ছেলেবেলাকার কিরণকে মনে করচে, তার চোখ দুটোয় আজ বাদ্‌লা নেমেচে।

এ-বাড়ীতে দুর্গার দুঃখ বুঝবার কেউ ছিলোনা। কিন্তু চাকর, চাকরাণী, সরকার এরা বুঝতো কার অধিকার—কাকে সম্মান করতে হয়। কিরণের সম্বন্ধী-দুটো চাকর-বাকরের উপর এত অত্যাচার করতো যে, তারা প্রায়ই দুর্গাকে নালিশ ক'রে যেতো।

একদিন দুর্গা তাদের খুব ধমক দিলে। কিন্তু তখন কি সে জানতো যে মায়ে-ঝিয়ে এসে তাকে অতবড় অপমানটা ক'রে যাবে! দুর্গা ছলছল্ চোখে বললে, "আমার অপরাধ হয়েচে বেন্, মাপ্ করো!"

"মানুষের আক্কেল থাকলে কেউ তাকে কিছু বলতে পারেনা—কার খাচ্চো তা' জানো? সতীন-ব্যাটা বড় ভালো ছেলে তাই, নাহ'লে কোন সংসারে দ্যাখে?"

"দ্যাখেনা, না বেন্?"

দুর্গার চোখ দিয়ে হুহু ক'রে জল পড়তে লাগলো। তার সঙ্গে কাঁদলে কেবল যাদের ক্ষমতা নেই এমন কতকগুলো হতভাগা অধীন চাকরের দল।

পাঁচটার সময় দুর্গা পাল্‌কীতে উঠতে যাচ্চে, এমন সময় ভিতর থেকে কিরণ হন্‌হন্‌ ক'রে ছুটে এসে জিগেস করলে, "কোথায় যাওয়া হ'চ্চে, শুনি ?"

দুর্গা মুখ নীচু ক'রে উত্তর করলে, "অনেকদিন দাদার ছেলেগুলোকে দেখিনি—"

বাধা দিয়ে কিরণ বললে, "এখানে কে ছ্যাখে ?"

দুর্গা কোনো উত্তর করলেনা, কিন্তু তার অন্তরটা যেন ব'লে দিলে—তোমার ভাবনা কি কিরণ! আজ যে তোমার সংসার দেখবার, তোমাকে দেখবার অনেক লোক আছে, দুর্গাকে দরকার হবে কি ?

কিরণ আবার বললে, "ফিরে চলো।"

"না।"

বড় গম্ভীর হ'য়ে দুর্গা এই কথাটা উচ্চারণ করলে।

কিরণ এবার রেগে বলতে লাগলো, "আমি জানি, তুমি চিরকালটাই পাঁচটা লোক দেখতে পারোনা মা !"

"কিরণ, তুইও ওই কথা বলবি রে !"

বেয়ারাগুলো দুর্গার হুকুম পেয়ে পালকী হাঁকিয়ে দিলে। কিরণ যখন মাথা তুলে দেখলে তখন পাল্‌কী অনেকদূর চ'লে গেছে। সে চেঁচিয়ে ভারি গলায় ডাক্‌লে, "তুমি ফিরে এসো মা, আমি সকলকে বিদেয় ক'রে দিচ্চি !"

*

* *

দশটার সময় দুটিখানি ভাত খেয়ে কিরণ উঠে পড়তেই স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে, "আজ যে এই-কটি ভাত খেলে? রোজই কি এমনি ভাত খাও?"

"তখন যে মা ছিলো!"

"তোমার মা কি রোজ তোমাকে সাম্‌নে ব'সে খাওয়াতো?"

"তোমরাই তো মাকে আমার সামনে আসতে দাওনি!"

কিরণের স্বরটা উছ্‌লে যেন জল গড়িয়ে পড়লো। স্ত্রী মুখ নীচু ক'রে বসে রইলো।

দুর্গা যাবার ক'টা মাসের মধ্যেই কিরণের শ্বাশুড়ী জমি কিনে একটা বাড়ী তৈরি করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সংসারের যেসব ভালো জিনিষ ছিলো, একটা-একটা ক'রে যেন উপে যেতে লাগলো। কিরণ দেখেও এসব কিছু দেখতোনা। সে একটা কথা বললে তাকে যেন সকলে ধমকে উঠতো। কিরণ খাবার সময় খেতো আর দিনরাত সদর ঘরে শুয়ে প'ড়ে থাকতো, শুধু ভাবতো। তার এমন চেহারা হয়েচে যে, তাকে যেন চেনা যায়না।

সরকার শিবনারাণ এসে বললে, "বাবু, একটু দেখুন!"

কিরণ মাতালের মত উত্তর করলে, "কি আর দেখবো, যে দেখবার সে কিরণকে ছেড়ে চলে গেছে!"

"আপনি গিয়ে মাকে ফিরিয়ে আমুন।"

"তুমি জানোনা শিবনারাণ, মাকে আমার চেনোনা!"

সরকার মুখ নীচু ক'রে চ'লে গেল। কিরণ প্রথমে মাষ্টারি তারপর ব্যবসা ক'রে যেসব রোজগার করেছিলো, সেগুলো ত্রু-জন সম্বন্ধীতে প'ড়ে বেশ আত্মসাৎ করতে লাগলো। রোজ-রোজ টাকা পয়সা চাওয়াতে কিরণ একদিন চাবিটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছিলো।

কিরণ সদর ঘরে শুয়ে আছে, বাড়ীতে কিরণের শাশুড়ী চাকর-চাকরাণীগুলোকে যেন চাবুক মেরে খাটাচ্ছে। সমস্ত বাড়ীটা যেন তারই ভয়ে সশঙ্কিত। সরকার শিবনারাণ বাজার নামিয়ে তাকে একটা-একটা পয়সা মিলিয়ে হিসেব দিচ্চে। এমন সময় একজন উঠোনে দাঁড়িয়ে উঁচু-গলায় বললে, "শিবনারাণ, ওদের বাড়ী থেকে বের ক'রে দাও!"

সকলে চমকে উঠলো। চাকর-চাকরাণীরা কাজ ফেলে ছুটে এলো, দেখলে, আধ-ছায়া উঠোনের মুখে দাঁড়িয়ে আজ পরের ব্যথার বোঝা নিতে স্বর্গ থেকে যেন করুণার রাণী মাথায় থান কাপড়ের আঁচলটি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ দেখালে, বোয়ের বড়-ভাই তার পিঠে যে বেত মেরেছে তার একটা কালসিটের দাগ। কেউ বললে, সাত-মাস সে মাইনে পায়নি। সকলেই কেঁদে উঠলো। আনন্দে শিবনারাণ হাতের বাকি পয়সাগুলো কিরণের শ্বাশুড়ীর সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, "আমাদের আর ভয় কি রে রামি, সাধন, আমাদের মা এয়েচে যে রে!"

সদর-ঘরে কিরণ চোখ বুজে প'ড়ে আছে, শুনতে পাচ্ছে মা এসেচে, তার চোখ দুটো জলে ভ'রে এলো, একবার মনে করলে ছুটে যাই, আবার ভাবলে—তার কি মাকে মুখে দেখাবার পথ আছে? নিঃশব্দ হ'য়ে সে আবার উপুড় হ'য়ে শুলো।

সরকার ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে এলো, বললে, "বাবু গিন্নীমা ফিরে এয়েছেন—"

কিরণ একবার জিগেস করলে, "কে শিবনারাণ, আমার মা?"

হুহু ক'রে চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, সে একবার মনে করলে মায়ের কাছে গিয়ে ক্ষমা চায়, আবার ভাবলে, মা কি আমার কাছে আসবেনা?"

খানিকক্ষণ সাড়া নেই তার, দুর্গা চৌকাটের সামনে এসে দাঁড়িয়েচে, শিবনারাণ বললে, "বাবু উঠুন, মা ওই যে দাঁড়িয়ে।"

ছুটে আসতে গিয়ে সামনে একটা পৈঠেতে হোঁচোট্ লেগে কিরণ প'ড়ে গেল। দুর্গা ছুটে গিয়ে তার মাথাটা কোলের উপর তুলে নিলে। দুর্গার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিলো। সে কিরণের গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে বললে, "আমার কিরণ এমন হ'য়ে গেছে কেন শিব-নারাণ?"

কিরণ হাতদুটো দুর্গার পায়ের উপর দিয়ে ছল্‌ছল্ চোখে বলতে লাগলো, "কিরণের মা যদি কিরণকে না-ভ্যাখে তবে এই হতভাগাকে পৃথিবীতে কে দেখবে? মা, আমায় ছেড়ে আর যেয়োনা, ওদের বিদেয় ক'রে দাও। আমি যে তোমার কোলে মাথা রেখে অনেকদিন ঘুমোইনি মা, একটু ব'সো!"

দুর্গা চোখের জলটা মুছে ফেললে, তারপর গম্ভীর হ'য়ে বললে, "ওদের বের ক'রে দাও শিবনারাণ! যারা আমার ছেলেকে মেরে ফেলতে বসেছিলো, তাদের আর একদণ্ড আমি এ-ভিটেতে জায়গা দোবোনা!"

মুখ নীচু ক'রে কিরণের শ্বাশুড়ী ছেলে দুটির সঙ্গে তখুনি সে বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেল।

———

—বৌদিদি

বড়বউ অর্চ্চনা ছোট দেওরটিকে মানুষ করিয়াছিল, তাই সে উপেনের শত অপরাধ সহ্য করিয়া যাইত। উপদ্রবের একটি কথাও এ-পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠ নগেন্দ্রনাথের কি মধ্যম যোগেন্দ্রনাথের কর্ণে গিয়া পৌঁছায় নাই। বৌদিদি দেবরের খুঁটিনাটি সারিয়া লইত, সতরঞ্চের কালিটুকু ধুইয়া ফেলিত, আবার শূন্য দোয়াত পূর্ণ করিয়া রাখিত। বীণা মায়ের কাছে নালিস করিত, "দেখ না মা, ছোটকাকা আমার মুড়ি কেড়ে খেয়ে নিলে।" বড়বউ মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইত, দু-একটা কথা বুঝাইত, বলিয়া দিত, "কাকার ওপর রাগ করতে নেই।"

সাত বছরের বালিকা দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া পলাইয়া যাইত, যেন সে বড় অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে। সে যে মেজকাকীর কথামত বলিতে আসিয়াছিল, এটা শেষে প্রকাশ হইয়া যাইত। অর্চ্চনা জায়ের উপর রাগ করিত, দু-কথা শুনাইয়া দিত।

*

* *

উপেন পিয়ারা খাইয়া, আখ্ চিবাইয়া, আমের খোসা কাটিয়া মেজ-বোয়ের ঘরের ভিতর এখানে-সেখানে ফেলিয়া আসিত। মায়া এসব দেখিতে পারিত্না, জ্বলিয়া উঠিত, রাঁধিতে-রাঁধিতে গালি দিত, "এসো, আজ

পাঁশ্ বেড়ে দোবো! এত দুষ্টুমি আমার চোদ্দপুরুষে দেখেনি! দিদি আদর দিয়ে মাথায় তুলেচে, খেয়ে-খেয়ে যেন বুনো মোষ হ'চ্চে।"

সহসা জলের ঘটি অদৃশ্য হইয়া যাইত, বাটির মাছ উপেনের মুখে গিয়া উঠিত। মায়া রাগিয়া খুন্তি ছুঁড়িয়া মারিত আর দেবর মাছ-ভাজা খাইতে-খাইতে, হাসিতে-হাসিতে পলাইয়া যাইত।

মেজবউ তখন বাড়ী ফাটাইয়া ফেলিত। অর্চ্চনা বিছানা-ঝাড়া ফেলিয়া রাখিয়া রান্নাঘরে আসিয়া উপস্থিত হইত, শুনিত—উপেন নাকি ভাতের হাঁড়িতে থুথু ফেলিয়া দিয়াছিল, মাছ-ভাজা খাইতে-খাইতে সেই হাতেই মোচার ঘণ্ট তুলিয়া লইয়াছিল, মায়া বারণ করিয়াছিল বলিয়া তাহার পিঠে একটা সজোরে কিল্ মারিয়া গিয়াছিল। ইহা প্রমাণ করিতে মেজবউ দু-ফোঁটা জল ফেলিয়া বসিত।

অর্চ্চনা মায়ার হাতদুটি ধরিয়া বলিত, "বোন, কি করবে বল, যদি তোমার পেটের ছেলেই হ'তো! লক্ষ্মীটি, ছি! এসব কথা, সংসারের এসব তুচ্ছ জিনিষ তাঁদের কাণে যেন ওঠেনা!"

পরে মাথায় হাত দিয়া দিব্যি করাইয়া লইত। তারপর নিধের মাকে ডাকিয়া চুপি-চুপি হাঁড়ি কিনাইয়া আনিত। বড়জা'র অনুরোধে মেজবউ অনেকটা চাপিয়া যাইত—বড়দিদি কি মনে করবে? তাই সে বলি-বলি করিয়াও স্বামীকে কিছু বলিতে সাহস করিতনা।

*

* *

উপেন দশটার সময় স্কুল যাইবার নাম করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইত, তারপর বোসেদের ভোলার সঙ্গে সারাটা দিন খেলিয়া কাটাইয়া দিত। কখনো তাদের বাগানে গিয়া সাঁতার কাটিত, গাছে উঠিয়া ফল পাড়িত, কখনো বা ভোলার পরামর্শে বিধবা নাপিত-বোয়ের লাউ-কুম্ড়ার গাছগুলো উপড়াইয়া দিয়া আসিত। এইরূপে বেলা পড়িয়া আসিলে উপেন্দ্রনাথ বই-খাতা বাগানের একধার হইতে কুড়াইয়া লইয়া, গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইত। অর্চ্চনা দেবরকে বাতাস করিত, বই-খাতা উপেনের হাত হইতে লইয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া আসিত।

মেজবউ ভাত বাড়িয়া দিলে উপেন খাইতে বসিত, কিন্তু তরকারি দিলে তার আদৌ পছন্দ হইতনা, রাগিয়া উঠিয়া যাইত, মুখ ভেঙাইয়া বলিত, "উন্নুন্মুখি, তোকে তরকারি দিতে কে বললে? যা' আমি খাবোনা!"

বড়বউ ছুটিয়া গিয়া তার হাত ধরিয়া আবার পাতে বসাইত, মায়াকে চোখ টিপিয়া তিরস্কার করিত, "মেজবউ, তোর কি আক্কেল! সত্যিই তো, এইটুকু তরকারি দিয়ে কি ভাত খাওয়া যায়?"

তারপর সে দেওরকে কাছে বসাইয়া খাওয়াইত, দুধটুকু পাতে ঢালিয়া দিত। আপনি না-খাইয়া যাহা কিছু ওস্রাইয়া রাখিত তাহা উপেনের পাতে গিয়া পড়িত।

*

* *

মায়াকে উপেন বড় জ্বালাতন করিত। প্রায়ই দুজনে ঝগড়া হইয়া যাইত। বড়বউ উভয়ের মধ্যে আসিয়া একজনকে বুঝাইয়া বলিত, আর-একজনকে দু'টো চড় মারিয়া সরাইয়া লইয়া যাইত। অর্চ্চনা আপনার ঘরে বসাইয়া উপেনকে কত বুঝাইত, বলিত, "ভাই উপেন! মেজ-বোয়ের সঙ্গে লাগো কেন? তোমার জন্যে যে আমায় কথা শুনতে হয়।"

বলিতে-বলিতে বড়বউ কখনো-কখনো কাঁদিয়া ফেলিত। উপেন ততক্ষণ বীণার সহিত 'আকৃড়ুম্-বাকৃড়ুম্' জুড়িয়া দিত, বৌদির বেদনা বুঝিতনা।

অর্চ্চনা দেওরকে প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসিত, লোকে কিছু বলিলে বা উপেনের নিন্দা করিলে সে একটিও কথা না-কহিয়া শুনিয়া যাইত। কারও বাছুরটিকে পাওয়া যাইতেছেনা, উপেন বোধহয় তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছে, ঘোষেদের চালের খোলা কে ইট্ মারিয়া ভাঙিয়া দিয়াছে, উপেন না-হইলে এসব কে করিতে গিয়াছে?—ইত্যাদি কত কি পাড়ার লোকে রোজই নালিস করিতে আসিত। বড়বউ সকলের পায়ে-হাতে ধরিয়া, দু-পয়সা দিয়া মিটাইয়া দিত। তারপর কাহাকেও কিছু না-বলিয়া, উপেনকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বেত দিয়া প্রহার করিত।

কেহ ধরিতে অসিলে সে রাগিয়া জ্বলিয়া উঠিত ; বলিত, "ও মরুক, তোমরা স'রে যাও, আজ ওর একদিন কি আমার একদিন !"

উপেন ছট্‌ফট্‌ করিত, কাঁদিয়া-কাঁদিয়া বলিত, "রাক্ষুসীরা আবার এখানে এসেচে ! শুধু আমাকে মার খাওয়াবার চেষ্টা !"

অর্চ্চনা নিজেই মারিয়া আবার কাঁদিয়া মরিত। সেদিন তার সকলের উপর রাগ হইত। ঘরে বাইরে যেন জোট্‌পাট্‌ করিয়া তার উপেনের কাঁধে দোষগুলো চাপাইয়া দিয়াছে। সে দেওরকে টানিয়া লইয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িত। উপেন ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বৌদির কোলে ঘুমাইয়া যাইত। অর্চ্চনা উঠিয়া তার পিঠে তেল গরম করিয়া দিত, বসিয়া-বসিয়া কাঁদিত, মেজবউ ডাকিলে সাড়া দিতনা, বীণা মা বলিয়া কাছে আসিলে একটা চড় ধরাইয়া দিত। চোখের জল মুছিয়া, উপেনের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, গভীর বেদনা চাপিয়া রাখিয়া বড়বউ ডাকিত, "উপেন, কিছু খাবিনি ভাই ?" উপেন জাগিয়া উঠিত, অভিমান করিত। বৌদিদি দেওরের একমুখে শতবার চুমা খাইত। তারপর কোলে বসাইয়া দুধ-মুড়ি মুখেতে তুলিয়া দিত, পিঠে হাত বুলাইতে-বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিত, "উপেন, কোথায় লেগেচে ভাই ?"

বালকের চক্ষু দিয়া জল পড়িত। অর্চ্চনা অস্থির হইয়া উঠিত, আপনাকে শত ধিক্কার দিত, বলিত, "আর কখনো অমন কাজ করিসনি রে !"

*

* *

ইহার পর উপেন দু-একদিন বেশ শান্ত-শিষ্টের মত কাটাইয়া দিয়াছিল, অর্চ্চনা যেন একটু স্বস্তি অনুভব করিয়াছিল। সে আকাশের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া বলিত, "ঠাকুর, তুমি তার সুমতি দাও। নাইতে যেন তার কেশ না-ছেঁড়ে!" কিন্তু কি জানি কেন উপেন সেদিন ভাতের কাঁশি আছড়াইয়া, মায়াকে শাসাইয়া চলিয়া গেল। বড়বউ তখন বুঝি গোয়াল-ঘরের পাট্‌ করিতেছিল।

একটু পরেই উপেন ফিরিয়া আসিল, ইট্‌ মারিয়া ভাতের হাঁড়ি ভাঙিয়া দিল, হাতে করিয়া থালা, গেলাস, বাটী ছুঁড়িয়া-ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। মেজবউ চেঁচাইতে-চেঁচাইতে নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। অর্চ্চনা ছুটিয়া আসিল, বলিল, "ওরে উপে, থাম্‌, আর আমায় জ্বালাসনি—তোর পায়ে মাথা খুঁড়ি, থাম্‌।"

দেওর বৌদিদিকে ধাক্কা মারিয়া পলায়ণ করিল। অর্চ্চনা সাম্‌লাইতে না-পারিয়া পড়িয়া গেল, একটি বাটীর কানায় কপাল কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। উপেন একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল, ভয়ে সে জড়সড় হইয়া গেল, বলিল, "আমার কি দোষ? ওই গুরুচোখীই তো পাতে বাসিভাতগুলো দিয়েছিল!"

বড়বউ উঠিয়া মায়াকে অনেকবার ডাকিল, অনেক সাধ্য-সাধনা

করিল, অনেক বুঝাইল, কিন্তু সাড়া পাইলনা। তারপর জিনিষপত্তর গুছাইয়া ভাবিতে বসিল—কিছু ঠিক করিতে পারিলনা। তার কপাল দিয়া তখনও রক্ত ঝরিতেছিল। বীণা ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল, জিজ্ঞাসা করিল, "মা, কে মেরেচে—ছোট কাকা?"

অর্চ্চনা স্বাভাবিক স্বরে বলিয়া গেল, "কই, না?"

বড়বউ বোধহয় ভুলিয়া গিয়াছিল। দেওরের কথা ভাবিতে-ভাবিতে, উপেনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে-করিতে বোধহয় সে আপনার যন্ত্রণা বুঝিতে পারে নাই।

অর্চ্চনা একবার মেজ-বোয়ের ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল, খুব অনুনয় করিয়া বলিল, "মেজবউ! দরজা না-খুলিস—শোন, সে অবোধ ছেলেমানুষ, তার একটু-আধটু দুষ্টুমি আমরা না-সইলে কে সইবে বোন্? লক্ষ্মীটি, আমার দিব্যি, যেন মেজ-ঠাকুরপো কিছু না-শোনে।"

মায়া হুঁ-বিসর্জ্জন কিছু করিলনা। বড়বউ চলিয়া আসিল, সমস্ত দিন একফোঁটা জল পর্য্যন্ত মুখে দিলনা। উপেন না-খাইয়া চলিয়া গিয়াছে, কোনমুখে সে ভাতের খাগোল মুখে তুলিবে? ভাতের কাছ হইতে ছেলে উঠিয়া গিয়াছে, কোনমুখে সে ভাতের কাছে বসিবে? সে চুপি-চুপি হরির মাকে পাঠাইয়া দিল, উপেনকে সঙ্গে লইয়া আসিবার সময় কিছু কিনিয়া আনিতেও বলিল, কিন্তু সে তার দেখা পায় নাই।

*

* *

মেজবউ স্বামীকে অনেক কথা বুঝাইয়া দিয়াছিল। উপেন তাহার কত না-লাঞ্ছনাই করিয়াছে! কতদিন মুখের ভাত কাড়িয়া খাইয়া লইয়াছে, তাহাকে হুট্ করিতেই মারিতে গিয়াছে, কত সখের জিনিষপত্তর তছরূপ করিয়া দিয়াছে। সে আজ কয়বৎসর ধরিয়া এ-সকল সহিয়া আসিয়াছে—ছোটটি বলিয়া কিছু মনে করে নাই। কিন্তু আজ সে আর কোনো মতেই থামিয়া থাকিবেনা, এ-অপমান কোনোমতেই মানিয়া যাইবেনা। বলিতে-বলিতে মেজ-বউ কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। উপেন তাহার বাপ-মাকে কটু কহিয়াছে, তাহাকেও ঘটি ছুঁড়িয়া মারিয়াছে। সে এ-বিষয় বড়-জা'র কাছে বলিতে গিয়াছিল, অর্চ্চনা নাকি তাহাকেই দোষ দিয়াছে। শেষে মায়া স্বামীর পা-দুটি ধরিয়া চোখের জল ফেলিতে-ফেলিতে বলিয়াছিল, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বাপের বাড়ী রেখে আসবে চল। আমি আর এ-যাতনার সংসারে থাকতে পারবোনা!"

মেজভাই যোগেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে বুঝাইয়া বলিয়াছিল যে, আজ সে একটা বিহিত করিবেই করিবে। উপেন যে তাহাদের প্রতি উপদ্রব করে, এ-বিষয়ে নিশ্চয় বড়-বোয়ের পরামর্শ আছে—স্বামী-স্ত্রীতে তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিল।

নগেন্দ্রনাথ যখন গৃহে আসিয়া দাবায় একটি চৌকির উপর বসিয়া

তামাক টানিতেছিলেন, অর্চ্চনা তখন তাহাকে দেবরের অতিশয় বিলম্ব হইতেছে বলিয়া, একবার খুঁজিয়া আসিবার জন্য বড় ধরিয়া বসিয়াছিল। এমন সময় যোগেন্দ্রনাথ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল; খুব গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "দাদা, আমায় পৃথক ক'রে দিন—"

হঠাৎ এ-কথার তাৎপর্য্য জ্যেষ্ঠ কিছু বুঝিতে পারিলেননা। উপার্জ্জনক্ষম ভায়ের কথা শুনিয়া নগেন্দ্রনাথ অবাক হইয়া গেলেন, একটু অনুরাগভরে কহিলেন, "তা' এখন রোজগার ক'ত্তে শিখেছিস, পৃথক হ'বি বইকি ভাই!"

"পৃথক যে আপনারাই করাচ্চেন, কোন্‌দিন একটা লোকের প্রাণ যাবে!"

"কেন? কি হয়েচে?"

নগেন্দ্রনাথ কিছু বুঝিতে না-পারিলেও অর্চ্চনার বুঝিতে বাকি রহিলনা। সে কপাটে মাথাটি ঠেস্ দিয়া দেওরের কথা শুনিতেছিল ও এক-একবার চম্‌কাইয়া উঠিতেছিল। নগেন্দ্রনাথ মধ্যমের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া, পত্নীকে দু'টো ভৎর্সনা করিয়াছিলেন এবং ভায়ের কথায় —কালই উপেনকে আলাদা করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

অর্চ্চনার মাথায় আগুন জ্বলিতেছে, সে যে তাকে একরত্তি বেলা হইতে মানুষ করিয়াছে! সে পাতের কাছে না-বসিলে তার খাইয়া পেট ভরেনা—উপেন যে এখন ভালো করিয়া কাপড়টাও পরিতে শেখে নাই! সে আর স্থির থাকিতে পারিলনা, ছুটিয়া গিয়া মেজ-দেওরের হাত দু'টি ধরিয়া বলিল, "মেজ-ঠাকুরপো, সে ছোট—"

যোগেন্দ্রনাথ হাত ছিনাইয়া লইল, কোন কথা না-বলিয়া হন্‌হন্‌ করিয়া চলিয়া গেল। অর্চ্চনা পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল, চক্ষু দিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

*

* *

বড়বউ সন্ধ্যাবেলা বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। কাঁপিতে-কাঁপিতে তাহার জ্বর আসিল। একটু পরেই উপেন সমস্তদিনের পর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল; একবার বড়-বৌদির ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল বড়-বৌদি শুইয়া আছে, বীণা মাথায় হাত বুলাইতেছে। সে আর সেখানে দেরি করিলনা, রান্নাঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যোগেন্দ্রনাথ খাইয়া উঠিয়া গেল, তাহাকে দেখিয়াও দেখিলনা। নগেন্দ্রনাথ অগ্রেই আহার সারিয়া লইয়াছিলেন। মায়া ফেন্‌ ফেলিতে যাইবার সময় তাহার চোখে চোখ পড়িয়াছিল। মেজবউ আহারে বসিয়া গেল, দেওর শুক্‌নো মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

অন্যদিন হইলে উপেন এতক্ষণ অপেক্ষা করিতনা, জোর করিয়া কাড়িয়া খাইয়া লইত। কিন্তু আজ বাড়ীতে আসিতেই বড়দাদা তার সঙ্গে কথা কয় নাই। মেজভাই খাইয়া উঠিয়া গেল, তাকে একবার মুখের কথাও জিজ্ঞাসা করে নাই, মায়া অশ্রদ্ধা করিয়াও তার সাম্‌নে একমুঠা বাড়িয়া দেয় নাই। উপেনের চক্ষু দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে সেখান হইতে চলিয়া আসিল, বড়-বৌদির ঘরে আস্তে-

আস্তে প্রবেশ করিল, অর্চ্চনার পা-ধরিয়া টানিতে লাগিল, আঙুল মোচ্‌ড়াইয়া দিল। বড়বউ চম্‌কাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে বীণা?"

"আমি সমস্তদিন কি খেয়েচি? নিজেরা গিলেচো, আমার বুঝি খিদে পায়নি?"

এমন সময় নগেন্দ্রনাথ আসিয়া ধমকাইয়া বলিলেন, "উপে, এ-ঘরে কেন? তোর ঘরে যা'।"

উপেন্দ্রনাথ এ-কথার অর্থ বুঝিতে না-পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমার ঘর?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোর ঘর—তোকে ভিন্ন ক'রে দিয়েচি।"

উপেন তবুও বুঝিতে পারিলনা, বৌদির মাথাটি নাড়াইতে-নাড়াইতে বলিল, "ও বৌদি, আমি খাবোনা?"

নগেন্দ্রনাথ তাহাকে টানিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। বৌদিদি স্বামীর কথার উপর কিছু বলিতে পারে নাই, কিন্তু চোখের জলে তাহার বালিস ভিজিয়া গিয়াছিল। উপেন অনেকক্ষণ দরজার সামনে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া, মাটির দিকে মুখ করিয়া চলিয়া গেল।

*

* *

উপেন আপনার অংশে দুখানি ঘর পাইয়াছে। থালা, বাসন, নগদ টাকাও ভাগ হইয়াছে। সে আস্তে-আস্তে আপনার ঘরটিতে প্রবেশ করিল, এদিক্‌-ওদিক্‌ চাহিয়া শুইয়া পড়িল।

সকালে খুব ভোরে উঠিয়া সে রাজ্যের ছেলে জড় করিল, সকলের হাতে একটি-একটি করিয়া বাটি, ঘটি, গেলাস দিয়া দিল, টাকাগুলো হরিলুটের মত ছড়াইতে-ছড়াইতে সে চান্ করিয়া আসিল। বড় ভাই চক্ষু বুজিয়া উপেনের এসব দেখিতে না-পারিয়া, পাড়ার একজনকে দিয়া দুটো কথা বলিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে কোনো কথা কাণে লয় নাই। উপেন আজ তিনদিন ঘরের বাহিরে যায় নাই, কাহারও সহিত মেশে নাই, কেবল তাহাকে বিছানায় পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। নগেন্দ্রনাথ একটা পাচক ব্রাহ্মণ ও একটি ঝি ছোট ভায়ের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তখনই তাহাদিগকে বিদায় হইতে হইয়াছিল, সে তাহাদিগকে স্থান দেয় নাই। ভায়েরা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন, উপেন এ-তিনদিন কিছুই খায় নাই। পাড়ার লোকের হাতে তাঁহারা কিছু খাবার দ্রব্য দিয়া, উপেনকে খাওয়াইয়া আসিতে বলিয়াছিলেন, অনেকবার খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। সে একবারও চাহিয়া দেখে নাই, উপুড় হইয়া শুইয়াছিল, বালিসের কোল হইতে একবারও মুখ তুলে নাই। কেবল কেহ ডাকিতে আসিলে সে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিত, "দূর, শুধু জ্বালাতন করে!"

বোসেদের ভোলা, দত্তদের বিনোদ ও কানাই সেদিন জমিদারদের বাড়ী ঠাকুর দেখিতে যাইবার সময় তাহাকে ডাকিয়া গিয়াছিল। সে মাথার অসুখের ভান্ করিয়া উঠিয়াও বসে নাই, একটি সাড়াও দেয় নাই, শুধু একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কবে পূজো রে?"

"এ কিরে! তুই জানিসনি? আজ যে পয়লা পূজো।"

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, "উপে, তোর এবার কি কাপড় হ'লো! বাবা আমার জন্যে এই ছাখ্ একটা সাটিনের জামা এনে দিয়েচে।"

"আমারও হবে। ওর চেয়ে ভালো জামা বড়-বৌদিদি আমায় কিনে দেবে। বৌদির অসুখ ব'লেই তাই! দেখিসনি, তোদের চেয়ে কত ভালো জামা কাপড় প'রে আরবারে আমি ঠাকুর দেখতে গেছ্লুম?"

কানাই বিনোদের গা-টিপিল, মুচ্‌কি-হাসিয়া বলিল, "হাঁরে, তোকে নাকি তোর দাদারা পেথোক্ ক'রে দিয়েচে?"

"হাঁ, দিয়েচে বই কি! তাহ'লে বুঝি আমি এই ঘরে থাকি? বউদি বল্লে তখন এসে আমায় খাবার খাইয়ে গেল!"

ভোলা বলিল, "তবে বীণুকে সাজিয়ে-গুজিয়ে তোর মেজ্‌দা ঠাকুর দেখতে গেল, তোকে ডাকলেনা?"

"না, ডাকেনি বই কি! আমি বল্লে মাথার যন্ত্রণায় উঠতে পারিনা!"

বিনোদ, কানাই ও ভোলা হাসিতে-হাসিতে চলিয়া গেল।

উপেন মনে বড় ব্যথা পাইল। বড়-দাদা বীণুর জন্যে নূতন জামা আনিয়াছে, তার কথা একবারও ভাবিয়া দেখে নাই! কেন, সে পৃথক হইয়াছে বলিয়া? সে তো পৃথক হইতে চায় নাই, তারা তো তাকে জোর করিয়া পৃথক করিয়া দিয়াছে। বড়-বৌদিদি চোখ্‌খাগী এসব কি দেখিতে পায়না! আজ কয়দিন সে মরিল কি বাঁচিল একবার খোঁজ লয় নাই—ইত্যাদি ভাবিতে-ভাবিতে উপেনের দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিয়ের ক'নে

*

* *

দশমীর দিন বিকালবেলা বাজ্না উঠিয়াছে। চতুর্দ্দিকে আনন্দ। নানারকমের কাপড়-চোপড় পরিয়া ছেলেরা হাত ধরাধরি করিয়া ঘুরিতেছে। অন্য-অন্য-বৎসর উপেনের বৌদিদি তাকে কেমন ভালো করিয়া সাজাইয়া দেয়! পাড়ার নবীন-জ্যেঠাকে, হীরু-কাকাকে ও বামুন-পিসীকে প্রণাম করিতে গিয়া সে কেমন আহ্লাদের সহিত বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া আসে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল তখনও উপেন একবারও উঠিলনা, বাইরে এত ধূমধাম একবারও দেখিতে গেলনা। বাড়ীর সবাই ঠাকুর দেখিতে গিয়াছে। মেজবউ ছাদে উঠিবার সময় একবার অর্চ্চনাকে ডাকিয়াছিল। সে অসুস্থ শরীরে বসিতে পারিবেনা বলিয়া কাটাইয়া দিয়াছিল। তারপর একটা পুটুলী মশারীর চাল হইতে তুলিয়া লইয়া একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া জ্বরে কাঁপিতে-কাঁপিতে বড়বউ উপেনের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। তার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল—উপেন কি হইয়া গিয়াছে! এত বজ্জাৎ, অমন দেহ যেন বিছানার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। অর্চ্চনা তাহার কাছে মুখটি লইয়া গিয়া অতি ধীরে-ধীরে ডাকিল, "উপেন, ঠাকুর দেখতে যাবিনি ভাই?"

"দূর, শুধু জ্বালাতন করে!"

অর্চ্চনা দেখিল, তার চোখের জলে বালিস ভিজিয়া গিয়াছে, পুনরায় ডাকিল, "আমি তোর জন্যে পূজোর পোষাক এনেচি, পরবিনি ভাই ?"

"না।"

"আমি যে তোর বৌদি রে! আমার কথা শুন্‌তে হয়।"

উপেন এতক্ষণ বুঝিতে পারে নাই যে, বৌদিদি তাহাকে ডাকিতেছে। সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, তারপর উঠিয়া বসিল। অর্চ্চনা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল, বলিল, "তোর জন্যে ছ্যাখ্ কেমন সিল্কের ফুলকাটা পাঞ্জাবী এনেচি, আয় ভাই, তোকে পরিয়ে দিই। কাপড়-চোপড় প'রে ঠাকুর দেখে এসোগে !"

তারপর সে আপনার ঘর হইতে এক-রেকাবী খাবার আনিয়া দেওরকে কোলে বসাইয়া মুখে তুলিয়া খাওয়াইয়া দিল। উপেন তার বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিল; এইবার বৌদির গলা জড়াইয়া বলিল, "আমি পেথক্ হবোনা বৌদি! আর দুষ্টুমী করবোনা, মেজ-বউকে আর কখনো কিছু বলবোনা, তোমার পায়ে পড়ি !"

অর্চ্চনা তাহার চোখের জল মুছাইতে গিয়া নিজেই কাঁদিয়া মরিল। তারপর আপনার ঘরে উপেনকে লইয়া গিয়া কাপড় জামা পরাইয়া দিল।

স্বামী ও মেজ-ঠাকুরপো যখন গৃহে ফিরিল, উপেন তখন বড়-বোয়ের ঘরে ঘুমাইতেছে। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলে অর্চ্চনা বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিয়াছিল, বলিয়াছিল, "আমরা নাহয় পর, তোমরা যে এক মায়ের ছেলে—অমন কথা মুখে আনো কেমন ক'রে ?"

—মামীমা

ভগিনী শরৎসুন্দরী মৃত্যুকালে ভ্রাতা হেমন্তকুমারের হস্তে তাহার একমাত্র পুত্র তারেশকে সঁপিয়া দিয়াছিল, আর একটা শপথ করাইয়া লইয়াছিল, যেন তার অবর্ত্তমানে পুত্রটিকে একটু লেখাপড়া শিখানো হয়। ভায়ের মুখে কিঞ্চিৎ সম্মতির আভাষ পাইয়া, বিধবা তারেশকে টানিয়া ভ্রাতৃবধূর শূন্য কোলে বসাইয়া দিল, বলিল, "বউ, তুই তো এখনো চাঁদের মুখ দেখিসনি, ঈশ্বরের ইচ্ছেয় তোর বাড়-বাড়ন্ত হোক্। তারেশকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখিস, তোর পাঁচটির মধ্যে যেন ও পাত কুড়িয়ে মানুষ হয়!"

মনে যাহাই থাকুকনা কেন, বিমলা কিন্তু এ-প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করে নাই, বরং বলিয়াছিল, তার সাধ্যমত চেষ্টার কোন ত্রুটী থাকিবেনা। তারেশ তখন চার-পাঁচ-বৎসরের অধিক হইবেনা। প্রথম-প্রথম মামীমার স্নেহযত্নে সে মায়ের অভাব বুঝিতে পারে নাই। হেমন্তবাবুও তাহাকে পুত্রাধিক ভালোবাসিতেন। ইহার প্রায় দুইবৎসর পরে বিমলা একটি কন্যা-সন্তান প্রসব করিল। অপুত্রক হেমন্তবাবু সদ্যঃ-প্রসূতাকে বুকে লইয়া পুত্রহীন জীবনের গ্লানিমা মুছিয়া ফেলিলেন। বিমলাও এতদিন শত উপেক্ষা সহ্য করিয়া, আঁচলের কোনে দুই বিন্দু মুছিয়া 'সকলই তাঁর হাত' বলিয়া কাটাইয়া দিত, আজ সে জগতের চক্ষে চক্ষু মিলাইতে পারিল, দশজন পুত্রবতীর মধ্যে আপনার স্থানটুকু করিয়া লইল, কোন শুভ কাজে তার আর নিমন্ত্রণ বাদ পড়িলনা।

*

* *

ধর্ম্মের দিকে একটু চাহিয়া, ভাগিনেয় সাত-আট বছরের হইলে হেমন্তবাবু তাহাকে একটি গ্রাম্য-পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এ-বিষয়ে স্বামী একবার পত্নীর অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তর বেশ অনুকূল হয় নাই। বিমলা বলিয়াছিল, "যতই কর, পরের ছেলে!"

যাহা হউক, এ-কথায় তিনি ততটা কর্ণপাত করেন নাই।

তারেশের পড়াশুনায় বেশ একটা অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যাইত। বর্ষাকালে যখন বাড়ীর কাছে এক-কোমর জল, মাথার উপর বৃষ্টিধারা, তারেশ তখনও একটা তালপাতার টোকা মাথায় দিয়া পাত্‌তাড়ী-বগলে পাঠশালায় উপস্থিত হইত। এজন্য কখনো-কখনো গুরুমহাশয়ও দু-একটা বকিতেন।

তারেশকে বাড়ীর প্রায় সকল কাজই করিতে হইত। হেমন্তবাবু কোন এক উকিলের মুহুরীগিরী করিতেন, গৃহ-কর্ম্ম দেখিবার তাঁর সময় ছিলনা। বেলা আটটার কম বিমলার ঘুম ভাঙিতনা। সংসারেও এমন কোন সচ্ছলতা ছিলনা যে, ঝি-চাকর রাখা যায়।

প্রত্যহ সকালবেলা হেমন্তবাবু ভাগিনেয়ের ঘুম ভাঙাইয়া দিতেন, বলিতেন, "খুঁকি কাঁদ্‌চে, ও-এখন উঠতে পাচ্চেনা, তুই বাসীপাট্‌গুলো ক'রে ফ্যাল্।

চক্ষু রগড়াইতে-রগড়াইতে, আট-দশ-বছরের বালক পৌষমাসের ঘাড়ভাঙা শীতে কাঁপিতে-কাঁপিতে বাসন মাজিত, গোয়ালঘর পরিষ্কার করিত, দালানগুলা ধুইয়া ফেলিত, আর ক্ষেত হইতে দৈনিক যা' শাক-সবজি তরি-তরকারি পাওয়া যায়, তুলিয়া আনিয়া রাখিয়া দিত। তারপর একটু দুধ গরম করিতে-করিতে মামীমাকে ডাকিত। কখনো সাড়া পাইত, কখনো হাজার ডাকেও উত্তর ছিলনা। এদিকে বেলা হইলে গুরুমহাশয় হাতছড়ি দেন, তাই বালক বড় কাতরে ভয়ে-ভয়ে ডাকিত, "মামীমা, ওঠোনা, বেলা হ'য়ে যাচ্চে—গুরুমশাই যে এক-পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখবে!"

কোনো-কোনোদিন গৃহিণী রক্তচক্ষে বিরক্তিভরে শুইয়া-শুইয়াই বলিত, "লেখাপড়া শিখে জজ-মেজষ্টর হবে!—দেখ তেরো, আমার শরীর খারাপ, জ্বালাতন করিসনি।"

বালক আর ডাকিতে সাহস করিতনা, চুপ করিয়া ঘরের এককোণে বসিয়া থাকিত।

*

*　*

বিমলার মেয়ের নাম আশালতা। বাপ কিন্তু আদর করিয়া কন্যাকে দুলালী বলিয়া ডাকিতেন। তারেশ পাঠশালার ছুটির পর মেয়েটিকে লইয়া কখনো বেড়াইত, কখনো চাঁদকে ডাকিয়া টিপ্ দিতে বলিত, কখনো ঝুমঝুমি বাজাইত, কখনো আস্তে-আস্তে তার গালের উপর ঝুঁকিয়া

পড়িয়া স্নেহভরে চুম্বন করিত। তারপর যখন কিছুতেই রাখিতে পারিতনা, তখন ভয়ে-ভয়ে রান্নাঘরের দরজার নিকট চুপ্‌টি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত—অমনি ঝপাৎ করিয়া ডালের হাঁড়িটা মাটির উপর বসাইয়া দিয়া তারেশের উদ্দেশে—"এক কুঁড়ে-পাথর গিলতে পারো আর মেয়েটাকে নিতে হ'লেই যেন মাথায় বাজ পড়ে!" ইত্যাদি বলিতে-বলিতে বিমলা বাহির হইয়া আসিয়া তারেশের কোল হইতে মেয়েটাকে ছিনাইয়া লইত। বালক মৌনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, চক্ষুদুটি জলে পুরিয়া আসিত।

সেদিন আর রান্না হইতনা। বিমলা মেয়েকে ঘুম পাড়াইতে গিয়া আর উঠিতনা। তারেশ একটি প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতে বসিত। সন্ধ্যার একটু পরেই হেমন্তবাবু গৃহে ফিরিতেন। রান্নাঘর হইতে কোনো সাড়া-শব্দ না-পাইলেই তাঁহার বুকখানা কাঁপিয়া উঠিত—আজ যে একটা কাণ্ড বাধিয়াছে এটা বুঝিতে বাকি থাকিতনা। তারপর নিজেই কুয়া হইতে জল তুলিয়া হাত-মুখ ধুইতেন, পত্নীকে ডাকিতে সাহস করিতেননা। কোনোদিন-বা বিমলা তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া তারেশের প্রদীপটি ব্যস্তভাবে তুলিয়া লইত। গরম তেল ফোঁটা-ফোঁটা করিয়া কখনো তার বইয়ের উপর, কখনো বা তার হাতের চেটোয় পড়িয়া যাইত। তারেশ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে নানা অপরাধে অভিযুক্ত হইত—"চোখ কি কাণা হ'য়ে গেছে? মানুষটা যে সারাদিন হাড়ভাঙা মেহনৎ ক'রে এলো, যদি অন্ধকারে পাতকোয় প'ড়েই যেতো? সমস্তদিন ফক্কুড়ি-তামাসা ক'রে বেড়াবে আর তুমি আসবার সময় হ'লেই ওর যত পড়ার চাড় এসে জোটে।"

শুধু কি এই সব? আরও কত কি! তাহার হইয়া দু-কথা বলিবার কেহ নাই দেখিয়া তারেশ চুপ করিয়া থাকিত।

তারপর সে-রাত্রে আহারের জন্য বড় গোলযোগ বাধিত। শুকনো ভাত, পাতে তরকারির সম্পর্ক নাই। হাঁড়িটি ভাঙিয়া গিয়া যেটুকু ডাল অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই একটু-একটু করিয়া সকলের পাতে পড়িত। ইহাও যে তারেশের দোষ, তাহা সালঙ্কারে স্বামীকে বুঝাইয়া দিতে বিমলা ক্ষান্ত হইতনা।

এই সব শুনিয়া-শুনিয়া ভদ্রলোক তিতি-বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। যখন আর সহ্য করিতে পারিতেননা, তখন আসন হইতে উঠিয়াই আহারে-রত ভাগিনেয়ের পৃষ্ঠে সশব্দে অনর্গল কিল-চড়-ঘুসি বর্ষণ করিতেন, তারপর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আর আহারে বসিতেননা, ক্রোধভরে আচমন করিতে চলিয়া যাইতেন।

তারেশ নীরবে বসিয়া-বসিয়া মার খাইত। এক-একবার বড় দুঃখে ছলছল চোখদুটি ঊর্দ্ধে উঠিয়া মামার মুখের উপর স্থির হইয়া থাকিত। সে-চাহনি যেন বলিত, 'মামা, আর আমায় মেরোনা, আমি তো কিছু করিনি!'

যেদিন অতিরিক্ত হইত, সেদিন বালক হেমন্তবাবুর পা-দুটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিত, "আর করবোনা। তোমার পায়ে পড়ি আর আমায় মেরোনা মামা, এই আমি নাকখৎ দিচ্চি।"

তার উপর কাঁদিবার উপায় ছিলনা। তাহা হইলে বিমলা সাতখানা হইয়া বলিত, "আহা-হা, ননীর-পুতুল! ওটি কম নয়, মিট্‌মিটে ডান্!

কি রাক্ষস ছেলে! টাউ-টাউ ক'রে গিলচে। পাঁচরকমে মানুষটাকে হাতে-নাতে ক'রে তবে ছাড়লে।"

তারেশ ভয়ে-ভয়ে ভাত খাইত, পাতের উপর টস্‌টস্‌ করিয়া জল পড়িত। তারপর আস্তে-আস্তে মুখ-হাত ধুইয়া, বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িত। তখন মায়ের কথা মনে পড়িয়া যাইত, বালক পৃথিবীতে তাহার দুঃখের দুঃখী কাহাকেও খুঁজিয়া পাইতনা, বালিসের কোলে মুখ লুকাইত।

*

* *

তারেশ এখন একটু বড় হইয়াছে, একটু বুঝিতে শিখিয়াছে। আগে মামীমা বকিলে সে অভিমান করিত। কেন করিবেনা? সে যে সেদিন বলাইদের বাড়ী গিয়াছিল, দেখিয়া আসিয়াছিল, কি-একটা দুষ্টুমীর জন্য বলাইয়ের মা ছেলেকে একটা কাণাটি দিলে, তাই লইয়া বলাই সমস্ত বাড়ীটা তোলপাড় করিয়া তুলিল এবং সমস্তদিন কিছু মুখে দিলনা। মা কত আদর করিলেন, "লক্ষ্মীটি আমার, সোনাটি আমার, এসো, খাবে এসো, বলাইয়ের মত সুবোধ ছেলে—কারো নেই!"

বলাই রাগ করিয়া দুধের বাটী উল্‌টাইয়া দিল, ভাতের কাঁসি মায়ের উপর ছুঁড়িয়া মারিল। তবুও কত যত্ন করিয়া মাছের কাঁটাটি বাছিয়া দিয়া তাহার মা তাহাকে খাওয়াইতে বসিলেন। তাই সেও রাগ করিয়া ঘরের

মধ্যে দুষ্টু টী হইয়া বসিয়া থাকিত, মনে করিয়া রাখিত, "মামী এলে মুখ ভার ক'রে থাকবো, দু-এক ডাকে যাবোনা।"

বালক পথ চাহিয়া থাকিত। একটু কিছু শব্দ হইলেই ঐ মামী আসিতেছে মনে করিয়া, বিছানায় ঘুমাইবার ভাণ করিয়া শুইয়া পড়িত। এইরূপে সমস্তদিন কাটিয়া যাইত, কেহ তাকে খাইতে ডাকিতনা। 'আশা কাঁদচে, মামীর খাওয়া হ'লো, এইবার বোধহয় আমার জন্যে ভাত বাড়চে।' সব থামিয়া গেল। এবার মন বলিতে লাগিল, 'মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে বুঝি স্থির হ'য়ে কাছে ব'সে খাওয়াবে।'

এইভাবে বহুক্ষণ কাটিবার পর তারেশ যখন আর ক্ষিদেয় থাকিতে পারিতনা, তখন বিমলার শুইবার ঘরের দরজায় ছুটিয়া গিয়া জোরে-জোরে আঘাত করিত, বলিত, "আমি বুঝি খাবোনা? ক্ষিদে পায়নি বুঝি?"

বিমলা ধমক্ দিয়া উঠিত, "এত দেমাক্ কেন? পেট্‌কো—যারা একদণ্ড ক্ষিদে সামাই করতে পারেনা, তাদের এত গুমোর কেন? রান্নাঘরে পাঁশ বেড়ে রেখে এসেচি, গেলোগে যাও!"

তারেশের মনে বড় দুঃখ হইত, চক্ষু দু-টি ভরিয়া আসিত। একবার মনে করিত, 'আজ আর কিছু খাবোনা।' আবার ক্ষিদেয় অস্থির হইয়া রান্নাঘরে ছুটিয়া যাইত। একটি কাঁসিতে ভাত, তারই উপর খানিকটা ডাল, ডালের কতকটা অংশ জুড়িয়া মাছের ঝোল এবং ঝোলের সঙ্গে অম্বল মিশিয়া থাকিত। সে এ-বিষয়ে কিছু আপত্তি তুলিতনা, আর কখনো অভিমান করিতনা। সে যে বলাইয়ের ভাগ্য লইয়া জন্মায় নাই,

বলাই যা-ক'রে তা' করিলে যে তার সাজিবেনা, এটা সে অনুমান করিয়াই লইয়াছিল।

*

* *

দুলালী এখন চলিতে শিখিয়াছে, চার-পাঁচ-বৎসরের হইয়াছে। সে বেগুনের বোঁটা, আমের কুশী, আলুর খোসা লইয়া পাকা-গিন্নীর মত তরকারি রাঁধিত। সকাল-সকাল উনানে আঁচ্ দিত, সাতটার আগে পঞ্চাশ-ব্যঞ্জন ভাত রাঁধিয়া বসিয়া থাকিত। তারপর পিঁড়ি পাতিয়া, মাটির থালায় খুব যত্ন করিয়া ভাত বাড়িয়া, তরকারিগুলা থালার পাশে থরে-থরে সাজাইয়া দিত, একটি মাছি বসিলে পাখা লইয়া বাতাস করিত।

তারেশ পাঠশালায় যাইবার সময় একটু ঘুরিয়া তার খেলাঘরের পাশ দিয়া যাইত, একবার সাড়া লইত, "কিরে দুলি, কি কচ্ছিস্?"

দুলালী অমনি তার হাত দুটি ধরিয়া টানিয়া পিঁড়ির উপর বসাইয়া দিত, বলিত, "দাদা, রান্না হ'য়ে গেছে, খেয়ে যাও, কেমন?"

তারেশ না-করিতে পারিতনা। এত আদর-যত্নে কেহ তার পাতের কোলে এ-পর্য্যন্ত একমুঠা ধরিয়া দেয় নাই। সাতদিন উপোস করিয়া থাকিলেও কেহ তাহাকে একবার মুখের কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। সে ধূলোর ভাত মাখিতে-মাখিতে দুলালীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত।

সে যে খেলাঘরে আসিয়াছে এটা ভুলিয়া যাইত, অন্যমনস্কে দু-এক গাল মুখে তুলিয়া দিত। দুলালী হাসিয়া উঠিলে তবে তার চমক ভাঙিত, তারপর আর বিলম্ব করিতনা, এদিক-ওদিক চাহিয়া দৌড়াইয়া পলাইয়া যাইত।'

*

* *

সকালবেলা তারেশ যখন বাসন মাজিত, দুলালী মায়ের কোল হইতে চুপি-চুপি চলিয়া আসিত। দাদাকে জলের ঘটিটা আগাইয়া দিত, ভায়ের পরিশ্রমের সাশ্রয় করিতে গিয়া ভগিনী ঘাগ্‌রায় পাঁশ মাখাইয়া ফেলিত। তারেশ গাম্ভীর্য্যের সহিত এগুলি হৃদয়ের এককোণে আঁকিয়া রাখিত। জগতের যত স্নেহ-করুণা বোধহয় সে ঐ ছোট্ট মুখখানির ভিতর দেখিতে পাইত।

বাজার হইতে খোল-ভূষির ঝুড়ি মাথায় করিয়া তারেশ যখন সেদিন গৃহে ফিরিল, কেহ তাহার মাথার বোঝা নামাইয়া লইতে তৎপর হইলনা। বিমলা আপন কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকিল। দুলালী কিন্তু খেলা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল, হাতদুটি বাড়াইয়া বলিল, "দাদা, নামিয়ে নোবো?" এই দুটি কথা তার হৃদয়ে বড় আঘাত করিল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বিমলা হাতের কাজটি সারিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "বিষোকাঠের মত দাঁড়িয়ে রয়েচিস যে? কি হারামজাদা ছেলে! আমি

যে একটা কাজ করচি, দেখতে পাচ্চোনা ? চোখের মাথা খেয়েচো নাকি ?" তারপর একহাত দিয়া মোটটা নামাইয়া লইল। তারেশের কপাল হইতে টস্‌টস্‌ করিয়া ঘাম ঝরিতেছিল। সে তখন আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিল, হাতছানি দিয়া তুলালীকে ডাকিয়া, গামছার গেরোটি খুলিয়া দু'খানি জিলাপী তার মুখের কাছে ধরিল। অমনি চিলের মত ছোঁ-মারিয়া, বিমলা মেয়ের মুখ হইতে জিলাপী তুটি কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিল, পিঠে একটা চড় মারিয়া কোলে তুলিয়া লইল, যাইতে-যাইতে বলিতে লাগিল, "ক্ষীর ছানা খেয়েও হতভাগা মেয়ের আশ মেটেনা ! কোথাকার-কে ? আহা-হা ! কি তুর্ল্লভ সামিগ্রীই এনে দিয়েচে !"

তারেশ হতভম্বের ন্যায় বসিয়া রহিল। সে নিজের জলপানির পয়সাটি দিয়া দোকানে গরম জিলাপী ভাজিতে দেখিয়া তার তুলালীর জন্য কিনিয়া আনিয়াছিল। তুলালী মিষ্টি খাইতে বড় ভালবাসে তাই নিজের জলপান না-কিনিয়া জিলাপী তুইটি বাঁধিয়া লইয়াছিল। রাস্তায় পিপাসা পাওয়ায় সে শুধু তু-আঁজলা জল খাইয়াছিল—একবারও গামছার খুঁটটি খোলে নাই। আজ সে মনে বড় ব্যথা পাইল। মামীমা তাহাকে পর করিয়া দিয়াছে, তার তুলালীকে মুখের খাবার খাইতে দেয় নাই, কোল হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। সে ধীরে-ধীরে ঘাটে পা ধুইতে গেল। তখনও তুলালীর কান্না থামে নাই। তারেশ সমস্ত তুপুর পুকুরঘাটে বসিয়া রহিল। মিত্তিরদের ছেলে শ্যাম জিজ্ঞাসা করিলেও সে কিছু উত্তর দিতে পারে নাই, কেবল টপ্‌টপ্‌ করিয়া নাকি ক-ফোঁটা জল তার চক্ষু দিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছিল।

*

* *

তারেশ দুলালীকে আর কোলে লইতনা। তাহার মাও আর তাহাকে ছাড়িতনা, তারেশের কাছে যাইতে দিতনা। সে তবুও ভুল করিয়া বসিত। কতদিন খাবার কিনিয়া রাস্তায় আসিতে-আসিতে যখন মনে পড়িয়া যাইত, সে পথে কারো ছেলেকে ডাকিয়া খাওয়াইয়া দিত, একবার কোলে লইয়া বসিত, আবার পিছন ফিরিয়া দেখিত, কি জানি যদি তার মা তাকে কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া যায়! তারেশ পুতুল কিনিয়া বলাইয়ের বোন্‌কে, শ্যামের ভাগ্‌নীকে দিয়া আসিত, কারো সঙ্গে ভালো করিয়া কথা কহিতনা, নিজের ঘরে চুপ্‌ করিয়া বসিয়া থাকিত। অনেকদিন আগে একদিন যখন তার মামা তাকে বাড়ী হইতে দূর হইয়া যাইতে বলিয়াছিল, সে আর কিছুই লয় নাই, কেবল দুলালীকে কোলে লইয়া সদর দরজা পার হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মামা মেয়েকে কাড়িয়া লইলে, অগত্যা তাহাকেও ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল!

সে তবে এ-সংসারে আর কি করিতে থাকিবে? যেদিকে দু'চক্ষু যায় চলিয়া যাইবে। পৃথিবীতে কেউ আপনার লোক নাই বলিয়া কি সে কাহারো বাড়ীতে চাকরি করিলে একমুঠো ভাত পাইবেনা? না-হয় অনাহারেই মরিয়া যাইবে। কিন্তু চোখের সামনে থাকিয়া দুলালীকে কোলে লইতে পারিবেনা, এটা সে কোনমতে সহিবেনা। তবে যে-ক'দিন দুলালীর অসুখ না-সারে, সে-কদিন দেখিয়া যাইবে।

*

* *

প্রথম-প্রথম দু-একদিন তারেশ রাগ করিয়া রোগীর ঘরে যায় নাই। ডাক্তার বাহিরে আসিলে তাঁহার ডিস্‌পেন্‌সারি পর্য্যন্ত গিয়া সে রোগের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিত। মামীমার উপর চক্ষু রাখিত, কিভাবে রোগীর তদ্বির হইতেছে বাহির হইতে দেখিত। ঘড়িতে ১০টা বাজিলে সে আপনমনে চেঁচাইয়া-চেঁচাইয়া বলিত, "দুঘণ্টা অন্তর হ'লে ৮টার সময় একবার, আর এই দশটা বাজ্‌লো।"

তার এ-কথায় বিমলার চমক ভাঙিত, আনাজ-কোটা ফেলিয়া রাখিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া আসিত। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তারেশ ঘড়ির দিকে চাহিয়া যখন ঔষধ খাওয়াইতে হইবে তাহা উঁচু গলায় ঘোষণা করিত। মেয়েকে মা-বাপ শত যত্ন করিলেও যেন তার ভালো লাগিতেছিলনা, কি জানি কেন সে দুলালীকে তাহাদের হাতে দিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলনা।

রোগ বাড়িল। তারেশ ডাক্তারের মুখে শুনিল, 'আশা বড় কম।' আর তার মান অভিমান রহিলনা, দৌড়াইয়া রোগীর ঘরে প্রবেশ করিল। সামনে মামাকে দেখিতে পাইয়া সে জ্বলিয়া উঠিল, যা' মুখে আসিল বলিয়া গেল। আজ সে মারের ভয় রাখেনা। মামীকে রোগীর বিছানা হইতে উঠাইয়া দিল। দুলালীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে আজ কদিন পরে জিজ্ঞাসা করিল, "দুলি! বোন্‌! দিদি! কেমন আছ?"

দুলালী আজ চারদিন একবারও চক্ষু মিলে নাই, তার গোল দেহ বিছানার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তারেশ চোখের জল মুছিয়া আবার ডাকিল, "দুলি, দিদি! তুমি আমার সঙ্গে কথা কইবেনা? আজ সাত-দিন তুমি যে আমার কোলে ওঠোনি বোন্!"

রোগব্যথিত শুক্‌নো মুখখানায় একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, দুলালী চক্ষু চাহিল, তার কোলে উঠিতে হাত বাড়াইল। তারেশ তাকে বুকে লইয়া এ-ক'দিনের আগুন নিবাইয়া ফেলিল।

তারপর ডাক্তারের সহিত যুক্তি করিয়া সে একমাস ধরিয়া রোগীর রীতিমত শুশ্রূষা করিল। তারেশ সারা রাতদিন দুলালীর কাছে বসিয়া থাকিত। মানা শতবার ডাকিলেও আহারের কথা ভুলিয়া যাইত। রাত্রে যখন হেমন্তবাবু, বিমলা, বড় ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন, তারেশ তখনও অপলকনেত্রে রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, গায়ে হাত বুলাইত, তার মুখে কিছু যন্ত্রণার চিহ্ন দেখিলে সে অস্থির হইয়া উঠিত। হঠাৎ বিমলার ঘুম ভাঙিয়া গেলে সে দেখিতে পাইত, তারেশ সেইভাবেই রোগী লইয়া বসিয়া আছে, ঘুম তার কিছুই করিতে পারে নাই। মেয়ের মা বলিয়া তাহার কেমন লজ্জা আসিত, মনে-মনে বলিত, 'পোড়া ঘুমটা সামাই করতে পারলুমনা কোনোদিন!'

*

* *

সমস্ত রাতের পর সকালবেলা যখন তারেশের চক্ষুদুটি বুজিয়া আসিত, ঢুলিতে-ঢুলিতে সে রোগীর পাশেই কখন একটু ঠাঁই করিয়া ঘুমাইয়া পড়িত। বিমলা কি জানি কেন সাতবার তার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত, আবার ফিরিয়া যাইত, অবশেষে একটি ছোট বালিস টানিয়া তারেশের মাথাটিতে দিয়া আসিত। বিমলা যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। মেয়ের জন্য দুধ আনিয়া সে তারেশের সম্মুখে রাখিয়া দিত, হেমন্তবাবুকে মাছ্ দিতে গিয়া তারেশের পাতে ফেলিয়া বসিত, একমুঠো চালভাজা খাইতে-খাইতে সে তারেশের গালে দিতে যাইত, আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিত।

আজকাল বিমলা বড় কম কথা কয়। একদিন হেমন্তবাবু তারেশকে ডাক্তারের বাড়ী হইতে ঔষধ লইয়া ফিরিবার সময় দশসের ভুষি আর পাঁচসের খইল আনিতে বলিয়া গেলেন। তারেশ ধামা লইয়া চলিয়া গেলে, সে ছুটিয়া গিয়া তার সামনে একটা পয়সা ফেলিয়া দিল। তারেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কি আনতে হবে মামি ?"

বিমলা কোনো কথা না-কহিয়া পয়সাটি কুড়াইয়া লইয়া রান্নাঘরে চলিয়া আসিতেছিল, তারেশ কি ভাবিয়া একটু হাসিল আর বিমলা আপনার গলদটুকু সারিয়া লইতে গলদঘর্ম্ম হইয়া গেল।

*

* *

দুলালী পথ্য পাইয়াছে। হেমন্তবাবু কাছারি গিয়াছেন। তারেশ বিছানায় শুইয়া-শুইয়া ডাক্ মুখস্থ করিতেছিল। বিমলা ধীরে-ধীরে তাহার গৃহে প্রবেশ করিল, দরজাটি ভেজাইয়া দিল। তারেশ আজ সকালে উঠিতে পারে নাই, ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বিমলাকেই বাসিপাট্‌গুলা সারিতে হইয়াছিল। কিন্তু অন্যদিনের মত আজ তার আহার বন্ধ হয় নাই। সে মনে করিয়াছিল সে আজ বাঁচিয়া গিয়াছে, এখন মামীকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল। তক্তপোষের এক কোণে সরিয়া গিয়া সে কাঁপিতে-কাঁপিতে বলিল, "আর করবোনা মামীমা, এবার রোজ ভোরে উঠ্‌বো। তোমার পায়ে পড়ি, আজ ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।"

"তারেশ, স'রে আয়!"

তারেশ দেখিল তার আর নিষ্কৃতির উপায় নাই। এরকম প্রহার লাঞ্ছনা সে বরাবর খাইয়া আসিতেছে, যেন এ-সকলের সঙ্গে সে পরিচিত হইয়া গিয়াছে। বিমলা দ্বিতীয়বার ডাকিলে, সে উদাসভাবে চলিয়া আসিল। মামীমা মারিয়া কুটিয়া ফেলিলেও কেহ তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিবেনা তাহা সে জানিত।

বিমলা তাহার হাত দুটি ধরিল। তারেশ সে-স্পর্শে চমকিয়া উঠিল।

একবার ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল, মামীমাই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিলনা—মামীমা পরের ছেলের প্রতি এত স্নেহ কবে হইতে করিতে শিখিয়াছে? তারেশ অনেক গভীর বেদনা হৃদয়ে পুষিয়া রাখিয়াছিল, আজ নয়-বৎসর কেহ তাহার প্রতি একদিনের তরেও স্নেহ ব্যবহার করে নাই, সে বিমলার বুকে মুখটি লুকাইয়া বড় বেদনার স্বরে বলিয়া ফেলিল, "মা—মামীমা?"

"বাবা!"

বিমলার চক্ষে জল, হৃদয়ে বুকভরা স্নেহ। সে তারেশের মুখটি আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিল।

...... * * * ......

তারেশ যখন অনাহারে অনিদ্রায় দুলালীর কাছে বসিয়া থাকিত, বিমলা তখন বড় ছোট হইয়া যাইত। তার মা না তাকে, তার হাত ধরিয়া সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিল? সে না কতদিন ছেলের মা হইয়াও তাকে মুখের ভাত খাইতে দেয় নাই? তার বুকে বড় যন্ত্রণা হইল, তাই সে তারেশকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল।

—ছোট-জাত

যখন একটি-একটি করিয়া প্রমথের সকল সঙ্গীগুলিই আনন্দে ফোর্থ-ক্লাসে "প্রোমোশন" পাইয়া উঠিয়া গেল, প্রমথ তখনও হেডমাষ্টার মহাশয়ের হাতের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া—এই ধীরেনের পর, না-হয় মতির পর নিশ্চয় আমার ডাক হইবে ভাবিতেছিল। ধীরেন, মতি, সুরেশ, কানাই একে-একে সকলেরই ডাক হইল, সকলেই চলিয়া গেল। প্রমথকে কেহ ডাকিলনা, কেহ একবার ভুলিয়াও তাহার নাম করিলনা।

সেদিন স্কুল জুড়িয়া আনন্দ। সকল ছেলেরই মুখে একটা ছোট-খাট আত্মসম্ভ্রমের হাসি। নূতন ক্লাসে বসিয়া ছেলেরা প্রশ্ন, নম্বর ও পরীক্ষার ফল লইয়া একটা বিরাট আন্দোলন করিতেছিল। যোগেন বলিল, "আমার বড়-দা যে ক'টা হিষ্ট্রীর দাগ দিয়ে দিয়েছিল—জানিস্ স'তে, ঠিক সেই ক'টাই পড়ে গেছ্‌লো; তোরা কেবল সব মুখস্ত ক'রে গাধার খাটুনি খেটে মরেচিস!"

সতীশ বলিল, "আমার অসুখ করেছিলো তাই, নাহ'লে দেখতুম্ একবার কানাই কেমন ক'রে ফাষ্ট হ'তো! তাই আর কি-এত আমার চাইতে বেশী নম্বর পেয়েচে মতি, বল-না—য়্যাঁ?"

অপর একটি সহপাঠীর সহিত কথা কহিতে-কহিতে সে-কথা কানাইয়ের কাণে গেল। অমনি পকেট হইতে 'প্রোগ্রেস-রিপোর্ট'টি বাহির করিয়া একটু তাচ্ছিল্যের সহিত কানাই বড় গলায় বলিয়া উঠিল "না-পারলে অমন কত লোকের অসুখ করে! কত বড় যে তুমি নির্লজ্জ সতীশ,

তা' আজ জানা গেল। এক-আধ নম্বর নয়, ১৩০ নম্বর! মিলিয়ে দেখ।"

এই বলিয়া যেমন কানাই আপনার হাতের কাগজটি সতীশের কাছে ফেলিয়া দিতে যাইতেছিল, অমনি ক্লাসের মাঝখানে মুখটি নীচু করিয়া প্রমথ অসিয়া দাঁড়াইল। সকলেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে-হাসি প্রমথের হৃদয়ে বড় আঘাত করিল। কানাই ছুটিয়া আসিয়া প্রমথের গলাটি বেড়িয়া বড় সহানুভূতির স্বরে বলিল, "তুই বুঝি উঠতে পারিসনি ভাই?"

প্রমথ এতক্ষণ জোর করিয়া চোখ হইতে জল পড়িতে দেয় নাই। এ-প্রশ্নে সে আর স্থির থাকিতে পারিলনা, কাঁদিয়া ফেলিল। কানাই আপনার কোঁচার খুঁটে তাহার মুখটি মুছিয়া দিয়া হাত ধরিয়া বলিল, "আয়, ভাবনা কি? আমি ৫৭৫ নম্বর পেয়েচি!"

"আমি তো কিছু পাইনি কানাই!"

বড় দুঃখে প্রমথের মুখ হইতে এই কথাটি বাহির হইল।

"পাস্‌নি? আয়, আমি তো পেয়েচি ভাই?"

এই কথা বলিয়া কানাই তাড়াতাড়ি 'স্কুল-লাইব্রেরী'তে আসিয়া উপস্থিত হইল। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় তখন অন্যান্য শিক্ষকদিগের সহিত কি একটা পরামর্শ করিতেছিলেন। কানাইকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া হস্ত-ইঙ্গিতে এখান হইতে যাইতে বলিলেন। কানাই হাত-জোড় করিয়া বলিল, "না-স্যার, আমি এখুনি চলে যাচ্চি। আমার একটা কথা শুন্‌তে হবে—"

তারপর আপনার 'প্রোগ্রেস্-রিপোর্টটি' হেড্‌মাষ্টারমহাশয়ের সাম্‌নে রাখিয়া কহিল, "স্যার, এত নম্বর আমার চাইনা, আড়ইশোয় পাস তো ? আমায় না-হয় দুশো পচাত্তর দিন্‌, আর বাকিটা—"

পশ্চাতে প্রমথকে দেখাইয়া দিয়া কানাই বলিল, "প্রমথকে দিন !"

সকল শিক্ষকই এই কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কানাই বড় লজ্জিত হইল, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক বেণী-মাধব ঘোষাল একটু ধমক্ দিয়া প্রমথকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "একে তো নিরেট গর্দ্দভ, তার ওপর কুবুদ্ধির জাহাজ ! আবার কানাইকে সুপারিস ধরা হয়েচে—এখান থেকে বেরো বলচি, নইলে চাব্‌কে লাল ক'রে দোবো !"

এই কথা বলিয়া যেন সত্য-সত্যই একটা বেত্রের অনুসন্ধানে তাঁহার বিস্ফারিত চক্ষু দুইটি গৃহটির চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসিল। অপমানিত প্রমথ জলভরা চোখে একবার কানাইয়ের দিকে চাহিয়া, ধীরে-ধীরে সে-গৃহ হইতে বাহিরে আসিল।

কানাই প্রমথকে প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসিত, জানিত, প্রমথ আর যাই হউক কিন্তু বড় সরল, সত্যবাদী। তাই শিক্ষকের এ-কথায় কানাই একটু উত্তেজিতস্বরে বলিয়া উঠিল, "না, কক্‌খনো না—প্রমথ্ সে ছেলে নয় ! সে আমায় সুপারিস ধরেনি, আমি নিজেই বলতে এসেচি !"

পরে একটু সংযত হইয়া কানাই আবার বলিল, "স্যার, আমায় 'লাষ্ট' ক'রে তুলে দিন, প্রমথকে—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হেডমাষ্টারমহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "যাও!"

কানাই বাহিরে আসিল।

প্রমথ গেটের ধারে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। কানাই ছুটিয়া গিয়া তাহার মুখের উপর মুখটি দিয়া বলিল, "এখনও কাঁদচিস্?"

"আর স্কুলে পড়বোনা!"

একটুও না-বুঝিয়া, না-ভাবিয়া কানাই উত্তর করিল, "আমিও না।"

"ছি! তুমি কেন পড়বেনা ভাই? ঈশ্বর না-করুন, তোমার কিসের অভাব?"

"অভাব! অভাব—"

আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কানাই বলিল, "অভাব—প্রমথের। জগতে সব আছে, কিন্তু প্রমথ তো একটা বই দুটো নেই ভাই!"

*

* *

"নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে-দিনে বাড়ে,
শ্রীনন্দ রাখিল নাম—"

"মা!"

কঞ্চির বেড়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া কে যেন ডাকিল, "মা!"

সিতু শতনাম বন্ধ করিয়া কাণ খাড়া করিয়া রহিল। প্রথমে

সে শুনিতে পায় নাই, খুলীর উপর মুড়ীর চাল উজাইতে-উজাইতে আপনার অতীত বর্ত্তমান ভুলিয়া ভগবানকে পুত্ররূপে দেখিতেছিল আর সঙ্গে-সঙ্গে বোধহয় তাহার হৃদয়ের উপর দিয়া কত আলোক ও অন্ধকারের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল। আবার তেম্‌নি মিষ্ট সুরে ডাক আসিল। ফুটন্ত চাল চুল্লীর উপর রহিল, মাতা ছুটিয়া গিয়া বাখারির আগরটার দড়ি খুলিয়া দিল, উৎকণ্ঠাভরে বলিল, "এত সকাল-সকাল ফিরে এলি যে পেমা ?"

এ-কথার কি উত্তর দিবে প্রমথ তাহা খুঁজিয়া পাইলনা। কেবল টপ্‌টপ্‌ করিয়া মাটির উপর তাহার বড়-বড় চোখ দুইটা দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সিতু তার অভিমানী ছেলেটিকে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া দাবায় আসিয়া বসিল। প্রমথের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত দিয়া জল মুছাইতে-মুছাইতে মাতা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েচে রে, মাষ্টারমশাই মেরেছেন বুঝি ? কি দুষ্টুমি করেছিলে বাবা ?"

হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বালক উত্তর করিল, "না, আমি কিছু দুষ্টুমি করিনি মা !"

এই কথা বলিয়া প্রমথ অধিকতর কাঁদিতে লাগিল। সিতু অস্থির হইয়া উঠিল। দৌড়াইয়া ঘরের ভিতরের মাচার উপর হইতে একটা পুরাণো হাঁড়ি লইয়া সে বাহিরে আসিল। তারপর ভিতর হইতে একটা মলিন নেকড়ার গ্রন্থি দন্তের সাহায্যে খুলিতে-খুলিতে বলিল, "তার জন্তে ভাবনা কি বাবা ? সিতু-কইবোত্‌নি এখনো মরেনি—যাও, মাইনে দিয়ে এসো !"

প্রমথ জানিত, ঘরে ধান নাই।. কাল সন্ধ্যাকালে নিধু ময়রা এক টাকা মুড়ির দাম দিয়া গিয়াছে। এই টাকায় মুড়ির চাল না-কিনিলে যে আজ-বাদে কাল তাহাদের উপোস করিয়া কাটাইতে হইবে একথা প্রমথ বুঝিল। মা তাহাকে কত ভালোবাসে, সে ভালো হইবে বলিয়া দুঃখিনীর কত চেষ্টা, প্রমথ বুদ্ধিমান না-হইলেও এটা খুব বুঝিতে পারিত। সে আপনাকে ধিক্কার দিতে-দিতে বড় বেদনাভরে ডাকিল, "মা!"

"কেন বাবা? যাও—কি করবে, তুমি যে গরীবের ছেলে! সময়ে মাইনে না-দিতে পারলে মাষ্টার-পণ্ডিত দুটো বকবে বইকি বাবা! সহ্য করতে শেখ্ বাবা প্রমথ, তোর বাপ নেই, আমি বিধবা—"

আপনার অঞ্চলটি চক্ষের উপর দিয়া সিতু যেমন বলিতেছিল তেমনি বলিতে লাগিল, "আমরা যে বড় দুঃখী রে!"

প্রমথ এই কথা শুনিয়া মায়ের বুকে মুখটি লুকাইয়া বলিল, "মা! এ-বছর আমি উঠতে পারিনি, ফেল হ'য়ে গেছি!"

বলিয়া সে বড় জোরে কাঁদিয়া উঠিল।

সিতু ইহাতে একটুমাত্রও বিচলিত হইলনা। সে সন্তানের গণ্ডস্থলে মৃদু আঘাত করিতে-করিতে বলিল, "তাতে হ'য়েচে কি? এ-বছর উঠতে পারোনি, আর-বছর পারবে।"

"না মা, আমি আর প'ড়বোনা!"

"কেন রে পেমা?"

একটু থামিয়া মায়ের আঁচলের খুঁট ধরিয়া টানিতে-টানিতে

প্রমথ উত্তর করিল, "মাষ্টাররা সব বলে, যদু বেরার ছেলে তো তুই, তোর আর কত বিদ্যে হবে! চাষার ছেলে, লাঙ্গল কেটে ভাত খাবি, স্কুলে কেন?" বলিতে-বলিতে প্রমথের স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। একটু থামিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া সে সজল চোখে আবার বলিল, "মা, আমায় আর স্কুলে যেতে বলবেনা, বল?"

"না বাবা, আর তোমায় স্কুলে যেতে হবেনা।"

সিতু থামিল, ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু মাষ্টাররা চাষাদের কি ভাবে, ভাবিতে তাহার শিরায়-শিরায় অগ্নি ছুটিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গর্ব্বভরে উঠানের দক্ষিণ দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া পুত্রকে বলিল, "ঐ মর্‌চেধরা লাঙ্গলটা নিয়ে বছরে চল্লিশ বিঘের ধান যখন যদুবেরার মরায়ে উঠ্‌তো, তখন কত বামুন-কায়েত অজন্মার বছরে তার কাছে মাথা হেঁট ক'রে খাবার জন্যে দু-মুঠো ধান চাইতে আসতো!"

আগুন তাহার চোখ মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল। সিতু রাগিলে ভালো মন্দ বুঝিতনা, তাই হিন্দু-স্ত্রীর মুখ দিয়া বড় সাবধানতাস্বত্তেও স্বামীর নাম বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। এবার পুত্রের চিবুকটা ধরিয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া সিতু বলিল, "প্রমথ, আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি কর, চাষের কাজে মন দিবি? যে-জোয়াল গরু-লাঙ্গল নিয়ে তিনি বারো-মাসে তেরো পার্ব্বন ক'রে কারো কাছে মাথা হেঁট না-ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার চালিয়ে গেছেন, তুই তাঁর ছেলে হ'য়ে তাঁর পথই বেছে নিবি?"

"তুমি আশীর্ব্বাদ কর মা!"

মাটির দিকে চাহিয়া, কতটা যে পুলক চাপিয়া প্রমথ একথা বলিল

তাহা কেবল অন্তর্যামীই জানিলেন।

সিতু তেমনি গর্ব্বভরে বলিল, "আশীর্ব্বাদ করি, তুই চাষার ছেলে যেন চাষা ব'লেই পরিচয় দিতে পারিস!"

*

* *

"কই রে ভাই পেন্নমথো! কই গো মা নন্দরাণি, তোমার গোপাল কই?"

সূর্য্য উঠিবার একটু পূর্ব্বে পাড়ার হারাণ মণ্ডল স্কন্ধে লাঙ্গল লইয়া, দুইটা হেলে-গরুর লেজ মুলিতে-মুলিতে, সিতুর কুঁড়ের সম্মুখ দিয়া যাইতে-যাইতে আগড়ের বাহির হইতে ডাকিল। তুলসীতলা মার্জ্জনা করিতে-করিতে নিতান্ত বালিকার ন্যায় সিতু একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "নন্দরাণীকে সে-কি ভয় ক'রে বাবা! তোমরা তো একটু দাব্‌বে না, ব্রজবাসীর অতটা আস্কারা না-পেলে কি কানাই এত দুষ্টু হ'তে পারতো!"

সিতু যেমন নিত্যকর্ম্ম করিতেছিল তেমনই করিতে লাগিল।

কাঁধের লাঙ্গলটি মাটির উপর ফেলিয়া,বলদ দুইটা ঝাঁপের একটা খাপ্পারিতে ফাঁস দিয়া, উঠানে পা-রাখিয়াই একটু স্নেহ-কঠিন-স্বরে সেই বৃদ্ধ পক্ককেশ মণ্ডল একবার হাঁকিল, "শালার এখনও ঘুম হচ্চে? মাজীর পো এতক্ষণ তিন বিঘে জমির ক্ষেত চ'ষে ফিরে এলো। ওঠ্‌ ভাই ওঠ্‌! চলনা, দাদা-

নাতিতে গিয়ে পাঁচ বিঘের একটা পাল্লা দিয়ে এসে মায়ের তিন কাঠা মুড়ি খেয়ে ফেলি।”

হারাণ একটু থামিল। বাসি ঝাঁটা ধুইয়া ঘাট হইতে সিতু ফিরিল। এখনও পিতৃতুল্য হারাণ মণ্ডলকে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে রাগিয়া উঠিল, বলিল, “সকালবেলা যারা ঘুমোয়, মা-লক্ষ্মী তাদের ছায়াও মাড়ায়না! আলসে, কুড়ে ছেলে, বাবা একঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলো বুড়ো মানুষ, তবু বিছানা আঁকড়ে প'ড়ে রয়েচে!”

“থাকগে মা! ওর কি আর কোদাল ধরবার বয়েস? আমাদের কপাল মন্দ তাই যা' বল। ও যখন দুপুর-বেলা গরু দুটো নিয়ে সারা মাঠটা লাঙ্গল করে আর কপাল দিয়ে শ্রাবণ মাসের বৃষ্টির মত ঘাম ঝরে, তখন আমার চোখ ফেটে জল আসে! কিন্তু আমি এই সকাল-বেলা ব'লে যাচ্ছি মা, যদি আমি ছিদাম মোড়লের ছেলে হই তাহ'লে তোর ও আঁধার ঘরে মাণিক! কোদাল ধরতেই জানতে পেরেচি মা, বছরে তোর গোলা উজিয়ে উঠবে। চাষার যদি আলিস্যি না-থাকে তাহ'লে হাতী তো তার দুয়োরে বাঁধা! কই ভাই, ওঠ্-ওঠ্, বেলাও হ'য়ে গেল।”

বৃদ্ধ একবার রৌদ্রের দিকে চাহিয়া আবার একটু অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই কথা শুনিতে-শুনিতে সিতুর চক্ষুদুটি উজ্জ্বল হইয়া আসিল। আর-একদিন সে এমনি করিয়াই ভাবিত, প্রমথ তখন 'এইট'-ক্লাসে পড়ে, পাড়ায় বাবুলাল মুখুয্যের মেজো ছেলে সুরেন ডিপুটী হইয়া সেই মানকারায় প্রথম আসিল। সিতু রাত্রে ন-বছরের ছেলের

মাথাটা নাড়িতে-নাড়িতে বলিত, "তোমার যদি আশীর্ব্বাদ থাকে, যদি আমার পোড়া-কপালে ও বাঁচে, তবে সুরেনের চেয়েও ভালো ছেলের মা ব'লে সকলের কাছে দাঁড়াতে পারবো!"

আজ আর ততদূর ভাবিবার দিন নাই। এখন আর সুরেনকে কোনো-প্রকারে প্রমথ হারাইতে পারিবেনা, স্কুল ছাড়িবার পর হইতে সিতু তাহা বুঝিয়াছিল। কিন্তু দশজন চাষার মধ্যে যদি সে একজন প্রধান হইয়া উঠিতে পারে তাহা হইলে সিতু যে বড় কম সুখী হইবেনা ইহা তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল। তারপর আঙুল কামড়াইতে-কামড়াইতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মাতা পুত্রকে উঠাইয়া দিল। কোমরে মালকোঁচা আঁটিয়া, একটা বেতের পালীতে এক-পালী মুড়ি লইয়া, গোয়াল হইতে হেলে দুটা তাড়াইয়া প্রমথ বাহির হইয়া পড়িল, বলিল, "এসো দাদা, নিধুখুড়োর গুড়ুকের আওয়াজ পাচ্ছি না—"

"কে গো, নিধুখুড়ো?"

"হ্যাঁ রে—কে গো মোড়লের পো নাকি গো?—এসো।"

বলিয়া নিধিরাম একবার উঁকি মারিয়া অগ্রসর হইল।

"দাদা, আমি খুড়োর সঙ্গে এগুই।"

বুড়া গরুর বাঁধন খুলিতেছিল। সিতু দাওয়ায় দাঁড়াইয়া একটু চেঁচাইয়া বলিল, "ওরে প্রমথ, হাল নিয়ে গেলিনি?"

প্রমথ তখন দু-এক পা আগাইয়াছিল, না-ফিরিয়াই বলিল, "দাদাকে দাও।...দাদা, আমার হালটা যেন ফেলে এসোনা।"

"দুষ্টু ছেলের আস্পর্দ্ধা দেখেচো? শোন্!"

"আবার কেন ফেরাস বেটি ? কই, কোথায় বল্‌না ?"

বলিয়া বৃদ্ধ হারাণ মণ্ডল আপনার লাঙ্গলটি এক কাঁধে ফেলিয়া, উঠানে প্রমথর লাঙ্গলটা পাইয়া অন্য কাঁধে স্থান দিয়া, হেলে দুইটা তাড়াইতে-তাড়াইতে মাঠের দিকে চলিল।

এই হারাণ মণ্ডলকে যদু বেরা 'ধর্ম্মবাপ' বলিয়াছিল। মানকারার পাশের তিন চারিটি গ্রামের মধ্যেও হারাণ মণ্ডলের বেশ একটু খাতির ছিল। কৈবর্ত্ত-জাতের মণি এই হারাণ মণ্ডল যাহার ছেলের অন্ন-প্রাশনে, মাতার শ্রাদ্ধে ও কন্যার বিবাহে পদার্পণ না-করিতেন তাহার আর নিস্তার ছিলনা। সমাজ তাহার গৃহে জলগ্রহণ করিবেনা, নাপিত, ব্রাহ্মণ তাহার কোনো ক্রিয়া কলাপে আসিতে সাহস করিবেনা, দেশের মধ্যে তাহাকে 'একঘরে' হইয়া থাকিতে হইবে, সুতরাং হারাণের অল্পাধিক দোষ কেহ বড় একটা দেখিতনা। যাহার নিকট হইতে সে দুই পয়সা ধার লইত তাহা আর সে পাইত কি না শুনি নাই, কাহারও সঙ্গে ভাগে জমি করিয়া সে দুইশত পশুরির একশত পঁচিশ পশুরি নিজের দিকে রাখিয়া বাকিটা অংশীদারকে দিয়াছে। হিসাবের বিষয়ে কেহ তাহার সহিত তর্ক করিলে সে রাগিয়া উঁচু গলায় বলিত, "আশুথ্‌-তলার পাঠশালে কি আমি ধারাপাত পড়িনি যে, তোমরা আমার হিসেবে ভুল ধরচ ? যত সব গো-মুখ্‌খুর সঙ্গে ব্যবসা !"

অনেকেই তাহার হিসাবের দৌড় দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিত। যাহা হউক, হারাণ মণ্ডলের একটা গুণ ছিল, যাহার কেহ ছিলনা তাহার হারাণ মণ্ডল ছিল। যাহার জমি নাই, লাঙ্গল নাই, বীজ নাই,

হারাণ মণ্ডল তাহাকে সব দিয়া আপনার ক্ষেতের অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দিত। জাতের মড়া কাঁধে লইতে, শোকের সংসারে দুটো সান্ত্বনার কথা বলিতে আর আপনার ছোট-জাতটাকে অত বড় করিয়া ভাবিতে বুঝি তাহার অপেক্ষা আর কেহ পারিতনা।

... * * * ...

যদু বেরা মরিবার পর জ্ঞাতিরা সব বিধবা সিতুর জমি-জমা ফাঁকি দিয়া লইল। সিতু দেখিয়াও দেখিলনা। সে জানিত, প্রমথ কখন মাঠে চাষ করিতে যাইবেনা। অনর্থক কুটুম্বের সহিত একটা মনান্তর করিয়া শত্রুবৃদ্ধি করি কেন? তাই সে এতদিন চোখ বুজিয়াছিল। এখন প্রমথ নিজে যখন স্বর্গগত বাপ-ঠাকুর্দ্দার পুণ্য-আশীর্ব্বাদে জাত-ব্যবসাই পরম আদরে মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, তখন আর তো সিতুর নিজের থাকিতে পরের দ্বারে হেনস্থা ভোগ করা চলেনা?

দুপুর-বেলার খাঁ-খাঁ রোদে তিনক্রোশ পথ ছেলেটার হাত ধরিয়া পূর্ণ সাতটি বৎসরের পর বড়-বধূ সিতুরাণী যখন পেরাজগাঁয়ে দেবর সাধুচরণের উঠানে পদার্পণ করিল, তখন আহারে-রত গৃহস্বামী একটিবার-মাত্র সদরের দিকে চাহিয়া আপনার পরমান্নের বাটীতে মনযোগ দিল আর ইঙ্গিতে পাকশালায় রন্ধনপরায়ণা গৃহিণীকে এই দুই নষ্ট-কেতুর আগমন ঘোষণা করিয়া ছাড়িল। সোৎসুক ছোটজা বাহিরে গিয়া সিতুর পদধূলি লইল এবং প্রমথের মুখে একটা চুম্বন করিল। সিতু

তাহার হাতটা ধরিয়া স্নেহভরে বলিল, "থাক বোন্, হাতের নোয়া বজ্জোর হোক তোমার, কেমন, ভাল আছিস তো?"

ছোট-বোয়ের মুখ দিয়া কথা সরিলনা। সাধুচরণ আহার সমাপ্ত করিয়া, একমুঠা ভাত হাতের চেটোয় লইয়া এইবার খিড়কীর পুষ্করিণীতে আচমন করিতে গমন করিল।

"কথা কচ্ছিসনা কেন রে তুলসি? এরি মধ্যে ভুলে গেলি ভাই? সাতটা-আটটা বছর আগে যে মুখে তুলে খাইয়ে দিয়েচি রে!"

"দিদি—"

এই কথা বলিয়া পিঠের কাপড় সরাইয়া দিয়া তুলসী অঝর-নয়নে তাহার বক্ষ আশ্রয় করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সিতু শিহরিয়া উঠিল। সারা-পিঠ জুড়িয়া কালসিটে পড়িয়া গিয়াছে, এ-মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে তাহার আর বিলম্ব হইলনা। সে পিঠে হাত বুলাইতে-বুলাইতে আর্দ্র চক্ষে বলিল, "কেন রে ছোট?"

ফুঁপাইতে-ফুঁপাইতে তুলসী উত্তর করিল, "ও-পাড়ার মানু ঠাকুরপোকে জান তো দিদি, তার বয়েসই বা কত! প্রায়ই আসে, আব্দার করে, যত্ন-আত্তি করি, হয়ত পান সাজতে-সাজতে গল্প করি—একদিন আমি হেঁসেলে জোড়া আছি, ওই অভাগীর মিছরি আনতে মানু আমার আঁচল থেকে পয়সা খুলে নিচ্ছে, এমন সময় উনি এসে দেখলেন—এতে দোষ কি দিদি?"

বলিয়া দাবায় কুলার উপর শায়িত কন্যাটিকে দেখাইয়া দিল।

"তাই কি এমন ক'রে চাঁড়াল 'গো-বেড়ান' করেচে?"

"না, অতীন ঠাকুর—"

"তিনি তো আমাদের বাপের বয়সি—উঃ!"

"উঃ-ই কর আর আঃ-ই কর বড়-বউ—এখন আমাদের অবস্থা খারাপ। তখন নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেচো, আর তোমার ভাবনাই-বা কি? প্রমথটা ব্যালেষ্টার-ফেলেষ্টার একটা হবে, পড়াচ্চো তো?"

এইরূপ একটা তীব্র বিদ্রূপ করিতে-করিতে মুখ হাত ধুইয়া সাধুচরণ তাহাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সিতু এ-কথার একটিও উত্তর করিলনা। যে সহনশীলতার-গুণে নারীজাতি জগতের অতি বড় আত্মঘাতী বিষও গলধঃকরণ করে, সেই সহিষ্ণুতাই তাহাকে এতবড় তীক্ষ্ণ শরেও কাতর করিতে পারিলনা। সিতু তাড়াতাড়ি দেবরের হাতটি ধরিয়া প্রমথর হাতটা তাহার উপর স্থাপন করিয়া কহিল, "আজ হ'তে 'ও' তোমার, তোমার হাতে ওকে সঁপে দিয়ে গেলুম; মারবে হয় মারো, রাখতে হয় রাখো—ও তো তোমাদেরিই রক্ত!"

"ওটা আগে ভাবা উচিৎ ছিল বউ, তখন দাদার গোটাকতক টাকার দেমাকে চোখে-কাণে দেখতে পেলেনা, ভিটে আঁকড়ে প'ড়ে রইলে—ওটাতে আমাদের তো একটা মটর-ক্ষেতও হ'তে পারতো? তখন কি আমরা তোমার ভার নিতে চাইনি?"

"তোমাদের ভার তোমরা না-নিলে কে নেবে ভাই?"

এই কথায় ক্রূর হাসিতে সাধুচরণের মুখটি রঞ্জিত হইয়া উঠিল, বলিল,

"এখন বল্‌বে বই কি ! কিন্তু কি করবো, এখন তো আর উপায় নেই—বাইরের কেচ্ছা তো আর সংসারে স্থান দিতে পারিনা ?"

সিতুর মুখটি সহসা পাংশু হইয়া গেল। সে সর্পদ্রংষ্ট রোগীর ন্যায় জড়িতকণ্ঠে কহিল, "কি বললে ঠাকুর-পো ?"

"হাঁ ! হাঁ—"

একটা ঝাঁকুনি দিয়া সাধুচরণ উত্তর করিল, "এই যে আজ আষাঢ় মাস, পুরো ন'টা বচ্ছর দাদা আমাদের কাঁদিয়ে রেখে চলে গেছেন, সেই থেকে সেই নিবান্ধব পুরীতে, এতটুকু যেখানে সাহায্য পাবার আশা নেই, সেখানে যে স্ত্রীলোকে—তুমি বড়-জা, তোমায় আর কি বলবো—লোকে তার বিষয় কি ভাবে ?"

"ঠাকুর-পো—উঃ !—"

এই কথা বলিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মাতা পুত্রকে আঁকড়াইয়া ধরিল। তারপর পুত্রের মাথায় আপনার কাপড়ের অঞ্চলটি দিয়া ফিরিয়া চলিল। শয়নঘরের দিকে গমন করিতে-করিতে পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া সাধুচরণ এবার অপেক্ষাকৃত সংযতস্বরে বলিল, "দাও, মরুগ্‌গে, দুপুরবেলা যখন এসেচে, একমুঠো দাও। আমি পুকুর-পাড় থেকে একটা কলাপাত কেটে এনে দিচ্চি—ওরে পিমে, ওইখানেই ব'সে পড়্‌—"

সিতু ফিরিয়া দাঁড়াইল, রাগে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল, এইবার বাঁধ ভাঙ্গিল। সে মর্দ্দিত-পুচ্ছা ফণীনীর ন্যায় ঘৃণায়, ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিল, "যেখানে মা-খুড়ী অপমানিতা হয়, সেখানে যে ছেলে, সে প্রাণ গেলেও পাত পাড়েনা !"

"এত দম্ভ থাক্‌বেনা বউ—!"

"যে-সব পাষণ্ড বাপ ছেলেকেও সন্দেহের চক্ষে ত্থাখে, তাদের ভাত খেতে ওই হতভাগী ভিন্ন আর কারও রুচি হবেনা। ও-যে ঘটের উপর হাত রেখে—তুমি চাঁড়াল হ'লেও দেবতা বলে মেনে নিয়েচে!"

এই বলিয়া হন্‌হন্‌ করিয়া সিতু জলার পথ ধরিয়া চলিয়া গেল। স্বামী রোষ-কটাক্ষে একবার স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিল। ছোটবউ তুলসী আপনার কন্যাটিকে কোলে লইয়া অভুক্ত প্রমথের সেই দুপুর-বেলাকার শুক্‌নো মুখটি স্মরণ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলনা।

*

* *

"পিসীমা?"

"কে রে, কেনো? আয় বাবা, এসো!"

"পিসে কোথা' গা?"

"কিরে? এই যে ভাত খাচ্ছি, খাবি তো আয়!"

ঘরের মেজেয় সম্মুখে একটা কেরোসিনের ডিপে জ্বালিয়া ঠিক সন্ধ্যার সময়টায় প্রমথ সারাদিনের পর খাইতে বসিয়াছিল। অন্য কিছুর জোগাড় নাই জানিয়া, একমুঠা বিরিকলায়ের ডাল আর গাছের দুটা বেগুণ ছিঁড়িয়া ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িতে সিতু আঁচলে দু-ফোঁটা জল মুছিয়া আজ তুলিয়া দিয়াছিল। তাহার উপর থাকিয়া-থাকিয়া রাবণের অনির্ব্বাণ চিতার মত সাধুচরণের কথাগুলি তাহার অন্তর মধ্যে

দপ্‌দপ্‌ করিয়া জলিয়া উঠিতেছিল। পুত্রকে ঘরের মেজেয় ভাত দিয়া, মাতা দাবায় বসিয়া মিথ্যা কলঙ্কের এই দুর্জ্জয় শেলটা বুক হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য কত-না যত্ন করিতেছিল। ঠিক এমনি সময়টায় বামুনদের কানাই আজ আটদিনের পর তা'র কুঁড়ে ঘরের উঠানে আসিয়া পিসীমা বলিয়া ডাকিল। তারপর যখন সে নিঃশব্দে প্রমথর সঙ্গে এক-থালায় ভাতে-ভাত খাইতে বসিয়া গেল, তখন সিতুর আর এতটুকু বেদনা রহিলনা। বিশল্যকরণীর ঘ্রাণে হতচেতনা লক্ষ্মণ যেমন উঠিয়া বসিয়াছিলেন, আজ কানাই তেমনি করিয়াই তাঁর হৃদয়টাকে গর্ব্বে উঁচু করিয়া দিল। সে ছুটিয়া গিয়া হাঁড়ি হইতে ভাত তুলিয়া দিতে-দিতে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে কানাই, তোর পিসীমারা শুদ্দূর যে রে, তোর খেতে ভক্তি হয় ?"

কানাই জোর দিয়া বলিল, "হয় না তো কি ? মেজবৌদি অত বড় কুলীন নেত্যধন গোস্বামীর নাত্‌নি, বলে তার হাতে খেয়েই আমার পেট ভরেনা !"

"তবু তো একটা জাতের উঁচু-নীচু আছে রে ?"

কানাই হাসিয়া উত্তর করিল, "বামুনের গলার এই দু-থাঁ সুতো ছিঁড়ে ফেললে, আমাতে আর প্রমথতে কতটুকু প্রভেদ থাকে পিসীমা ? এটা কেবল হুঁকোর মাথায় কড়ি বেঁধে মিথ্যে বাছ্‌-বিচার করা, কিন্তু এই মূল্যহীন কড়ি-দুটো দূর ক'রে দিলে তাকে বেছে নেবার আর উপায় থাকেনা।"

সে স্বাভাবিক-ভাবে খাইতে লাগিল। সিতুর দুই চক্ষু দিয়া দুইটা

প্রবল জলধারা গড়াইয়া পড়িল। সে বসিয়া পড়িয়া কানাইয়ের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল, "তোদের পিসীমা যে কলঙ্কী রে কানাই! প্রমথকে নিয়ে ওর কাকা—ওরে জাতে যে কেউ চলবে-না রে?"

কানাই সরলভাবে উত্তর করিল, "তুমি ভেবোনা পিসীমা, প্রমথকে নিয়ে কেউ না-চলে আমরা চলবো। পিমেকে নিয়ে আমরা যে চার ভাই, ওকে ওর জাতে না-নিয়ে চললে আমরা তো আর আমাদের ভাইটিকে ফেলে দিতে পারিনা? এতে আমাদের জাত আমাদের সঙ্গে চলুক আর নাই চলুক!"

"কানাই?"

"তুমি দেখে নিয়ো পিসীমা—"

"পিমের মা, আমাদের ছোটবাবু আছে গা?"

"কেরে, কদমি? এই যে আমি ভাত খাচ্চি।"

সিতু শিহরিয়া উঠিল, এই ছেলেটির সাহস তাহাকে অবাক করিয়া দিল। কদম জোরে পা-ফেলিয়া চৌকাট ডিঙ্গাইয়া পা দিয়া পাড়া কাঁপাইয়া বলিল, "তোমার আস্পর্দ্ধা তো বড় কম দেখচিনা ছোটবাবু, এই সবে কাল ফাঁকে বেরিয়েচো, নতুন দণ্ডী, আর বামুনের ছেলে কইবোতের বাড়ী ভাত খাচ্চো! বুড়ো মাগী—তোমারই বা আক্কেল কি?"

"খবরদার কদ্‌মি, উনি আমার পিসীমা! খাচ্ছি তাই কি?—আমার খুসী।"

"আচ্ছা তাই হবে, মেজোবাবু কাছারি থেকে আসুন।"

একটা ভাবী অশুভের সূচনা জানাইয়া গম্‌গম্‌ করিয়া মাটি কাঁপাইয়া কদমমণি চলিয়া গেল।

"বলগে যা' তোর সুরেনবাবুকে, 'আমি তার মত লুকিয়ে মুসলমানের খানা খেয়ে এসে, ঘরে পরম বৈষ্ণব সেজে নারায়ণশিলার পুজো করিনা!"

চক্ষু লাল করিয়া উত্তেজিত কানাই বিনা বিচারে এইসব সত্যগুলি প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

"আমি পিসীমার হাঁড়ীতে খাই, কে না-জানে? প্রমথ আমার আপনার ভাই, পিসীমা আমার পিসীমা!"

"তাই হবে!"

দূর হইতে কানাইয়ের কথাগুলি বুঝি শুনিতে পাইয়াই কদম সংক্ষেপে শাস্তির গুরুত্বটা বুঝাইয়া দিয়া হন্‌হন্‌ করিয়া চলিয়া গেল।

*

* *

কদম—কদমচালে যখন মুনিববাড়ী ফিরিয়া আসিল তখন মেজগিন্নী সনাতনী অফিস-প্রত্যাগত স্বামীর জন্য সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা করিতেছিল। দালানের অদূরে বিধবা শাশুড়ী রমা কানাইয়ের বৈকালের জলখাবারটা কাছে লইয়া সদরের দিকে নির্ণিমেষনেত্রে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন। কদম আনন্দে আজকের এই ঘটনাটা সনাতনীর কাছে না-

বলিয়া থাকিতে পারিলনা। কদম সনাতনীর হাতের অস্ত্র। আর সনাতনী এই সংসারে দাঁড়াইয়া যখনই যেদিকে যাহারই উপর সেই অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইতে হইয়াছে। বিধবার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিলেও তিনি কি-একটা অনুমান করিয়া পাশের বাতিটা একবার উস্কাইয়া দিলেন। সে-আলোক কদম ও মেজ-বউয়ের চক্ষে তীরের মত বিঁধিল। তাহারা চোরের মত দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।

রমার অন্তরটা কাঁপিয়া উঠিল। এমনই একটা অশুভ সন্ধ্যার কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু সেদিন তাঁহার সংসার মা-লক্ষ্মীর কৃপায় পূর্ণ ছিল, ষষ্ঠীর অনুগ্রহে দিকে-দিকে ছোট-বড়র চীৎকারে মুখরিত ছিল। কিন্তু আজ তাঁহার শূন্য সংসারে শোভনীয় কিছুই নাই, হিংসা করিবার কিছুই নাই, তবে তাঁহার ভয় কি? শত কদম, শত মেজবউ একত্র হইয়া আজ পরামর্শ করিলেও তাঁহার কি করিতে পারিবে? তিনি তো রিক্ত হইয়া, সর্ব্বস্ব-হারা হইয়া বসিয়া আছেন; আজ আবার তাঁহার কি সম্পদ আছে, কি লইবে? এই দুশ্চিন্তাটাকে যতই উপেক্ষা করিয়া তিনি দূরে ফেলিয়া দিতে যাইতেছিলেন, ততই তাঁহার শতপুত্রহারা গান্ধারীর মত মনে হইতেছিল যে, চক্রীদের চক্রে হয়ত তাঁহার অদৃষ্টে আরও কত কি সহিবার ও দেখিবার আছে। সহসা একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, তিনি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বুকটাকে চাপিয়া ধরিলেন।

কানাই আসিয়া ডাকিল, "মা!"

রমা উঠিয়া তাহাকে তাঁহার দুরুদুরু বুকের মধ্যে তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিলেন। যেন অদূর আকাশে বাজ-পক্ষীকে দেখিয়া বিড়ালী সন্ত্রস্তা হইয়া অসহায় ছানাটির উপর শুইয়া পড়িল। মাতা আস্তে-আস্তে ছেলের মুখে দুধের বাটি তুলিয়া দিলেন। এমন সময় সিঁড়িতে মেজদাদার কড়া আওয়াজ শুনিতে পাইয়া কানাই একবার চমকিয়া উঠিল, শুনিতে পাইল, মেজদাদা রুক্ষস্বরে কদমকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, "হ্যাঁ, তুই স্বচক্ষে দেখে এলি! হতভাগাটাকে এ-বাড়ীতে আর ঢুকতে দেওয়া হবেনা। যা, সদর বন্ধ ক'রে দিয়ে আয়, না, আমি নিজেই নীচে যাচ্ছি!"

পরমুহূর্ত্তে সুরেন্দ্রনাথ নীচে নামিয়া আসিল। আহ্নিক করিবার আসনটার উপর দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ এইবার মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার ছেলেকে আর এ-বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া হবেনা মা—"

পশ্চাৎ হইতে কদম বলিয়া উঠিল, "ঐ যে কানাই!"

সুরেন্দ্রনাথ এইবার বিষম রাগিয়া পায়ের চটিটা হাতে তুলিয়া বলিল, "কেনো? বেরো বলচি এ-বাড়ী থেকে, নইলে জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোবো!"

ভয়ে-ভয়ে কানাইকে আঁচলের মধ্যে লুকাইয়া বৃদ্ধা মাতা করুণস্বরে উত্তর করিলেন, "ও-ছেলেমানুষ, তোরা ওর দোষগুলো অমন কঠিন ক'রে দেখ্‌বি রে সুরো?"

"তুমি কি বল, ওই হতভাগাটার জন্যে বংশের কলঙ্ক কিনবো—

ব্রাহ্মণের সমাজ, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ত্যাগ করবো? যে কইবোতের হাঁড়ির ভাত খেয়ে আসে তাকে এই বাড়ীতে স্থান দিয়ে শালগ্রাম-শিলার অপমান করবো? না, তা' আমি কখনোও পারবোনা—ও দূর হ'য়ে যাক্!"

কাঁপিতে-কাঁপিতে রমা বলিলেন, "সে তো কিছু বলতোনা রে সুরো? সেই তো ওকে ছেলেবেলা থেকে ওদের সঙ্গে অত মেশামিশি করতে সুযোগ দিয়েছিল। সে যদি থাকতো, বোধহয় এগুলো চোখে দেখেও দেখতোনা!"

সুরেন এবার তাচ্ছিল্য করিয়া উত্তর করিল, "বলতে কি, বাবা তখন তো আর জানতেননা যে অতবড় কুলীনের মেয়েকে সংসারে আনতে পারবেন—কাজেই এখন আমাদের সমাজ দেখে কাজ করতে হবে।"

রমা ধীরে-ধীরে উত্তর করিলেন, "কুলীন—তাঁর চেয়ে কুলীন—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বাংলার আদি গোস্বামী-বংশ!"

এইবার কানাই মুখ তুলিয়া রাগিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে আবেগে বলিয়া উঠিল, "মেজদা, ওই আসনখানার উপর ব'সেই না বাবার তর্পণ করেছিলে তুমি?"

কদম গালে হাত দিয়া যেন অবাক হইয়া গেল, বলিল, "লেখাপড়া শিখে বড়-ভায়ের মুখের ওপর কথা? তোমাদের ভদ্রলোকের ঘর, আমরা ছোটলোক, মুখ্‌খু, তবুও বড় ভাইকে দেখলে যেন সব জুজু!"

সুরেন্দ্রনাথের রাগের আগুনে কাঠ যোগাইয়া দিল কদম। সুরেন্দ্রনাথ এইবার দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া অনেক অযথা কথা কানাইয়ের বিপক্ষে

বলিয়া ফেলিল, কিন্তু যেই সুরেন্দ্রনাথ ধর্ম্ম ও ন্যায়ের দোহাই দিয়া—ভাই হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত এতবড় কথাটা উচ্চারণ করিল, অমনি কানাই তেজ করিয়া দাঁড়াইয়া একটা কথা বলিয়া উঠিল, "মেজদা, তুমি ন্যায় কথাটা উচ্চারণ করলে, ন্যায়ের উপরে আমাদের ঘেন্না হয়! বড়দা মরবার পর আর-একদিন এমনি ন্যায় দেখিয়ে, সাতটা ছেলে মেয়ে নিয়ে মুখুয্যে-বংশের লক্ষ্মী বড়বৌদিকে এ-বাড়ীতে মাথা গলাতে দাওনি—"

একটু থামিয়া কানাই সেল্‌ফের বইগুলো ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে-দিতে আবার বলিতে লাগিল, "এইসব বইগুলো আইন শেখা, ন্যায় শেখার নাম ক'রে পড়ে, ডেপুটী হ'য়ে যদি কেবল ভালো ক'রে একজন হতভাগিনীকে ফাঁকি দেবারই সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম মতলবগুলোই শেখা হয়, তবে কানাই চিরকালই মুখ্‌খু হ'য়ে থাকবে—বই সে আর কোনো-দিনই হাতে করবেনা!"

কানাই রাগিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল। নিরুপায় মা বসিয়া-বসিয়া অঝর-নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। কদম সনাতনীর গা-টিপিয়া একবার মুখ মুচকাইয়া হাসিল আর আসনের উপর বসিয়া সুরেন্দ্রনাথ নিজের দোষ-গুণগুলা খতাইয়া দেখিতে লাগিল। দেখিল, সে যাহা করিয়াছে, সে যাহা দেখিয়াছে, সে সবই আর-একজনের কথার উপর নির্ভর করিয়া, আর-একজনের চক্ষে দেখিয়া। সে কখনও নিজের চক্ষে দেখে নাই। সে ধর্ম্মের নাম শুনিয়া আসিয়াছে, ধর্ম্ম কখন আস্বাদন করে নাই। সে জানিত, গায়ত্রী ত্রিসন্ধ্যা না-করিলে ব্রাহ্মণকে আচারভ্রষ্ট হইতে হয়, কিন্তু

নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের ন্যায়তঃ অধিকার টানিয়া লইলে ধর্ম্মের হানি হয়না, অধিকন্তু তাহাতে নিজেরই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া যায়। ইহাকেই সে শিক্ষার ফল বলিয়া জানিত, গর্ব্ব করিত। কিন্তু আজ তার ছোট-ভাই, বয়সে ছোট—শিক্ষায় ছোট হইয়া যে কথাগুলি বলিয়া গেল, তার এত তীব্রতা, এত শক্তি যে, এক নিমিষে তাহার এতদিনের শিক্ষার অহঙ্কার চুর হইয়া গেল।

*

* *

পরদিন সকালবেলা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছিল। দু-একজন ভিন্ন শীতকালের সেই আড়ষ্ট সকালটায় কেহ বড় একটা চলা-ফেরা করিতেছিলনা। উত্তরের শী-শী হাওয়াটকে বিদ্রূপ করিয়া গায়ে নামাবলি জড়াইয়া, মুখে 'দশাবতার স্তোত্র' পাঠ করিতে-করিতে সুরেন্দ্রনাথ চলিতেছিল। সহসা সম্মুখে একটা আর্ত্তনাদ শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, দেখিল, একটি মেছোর মেয়ে, বয়েস অনেক হইয়াছে, মাথায় একটুকরি মাছ লইয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। মাথার বোঝাটা কেহ না-ধরিলে বোধহয় টুকরিটা তার কাঁধের উপর পড়িয়া যাইবে। রাস্তায় আর একজনকেও দেখিতে না-পাইয়া বুড়ী সুরেন্দ্রনাথকে বড় অনুনয় করিয়া বলিল, "একবার ধর বাবা, বোধহয় মাথার বোঝা আমার কাঁধে প'ড়ে যায়—"

সুরেন্দ্রনাথ তিনহাত সরিয়া আসিয়া বুড়ীকে একটা ধমক দিয়া বলিল, "খবরদার মাগী, আমি ব্রাহ্মণ—প্রাতঃস্নান ক'রে যাচ্চি, ঘরে গিয়ে নারায়ণের পূজা করতে হবে—"

"ওগো, কে আছ—আমার মাথার বোঝাটা একবার ধর !"

বুড়ী থরথর্ করিয়া কাঁপিতেছিল এবং মাথার টুক্‌রিটা টল্‌মল্ করিয়া নড়িতেছিল। আর তারই পাঁচহাত দূরে একজন ধর্ম্মের ভাণ করিয়া একজনকে আসন্ন বিপদের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিলনা। এমন সময় প্রমথ কোথায় ছিল ছুটিয়া আসিল, হাতের গঙ্গাজলের ঘটটা মাটির উপর রাখিয়া বুড়ীর মাথার মোটটা নামাইয়া দিল। বুড়ী মাতালের মত টলিতে-টলিতে মাটির উপর বসিয়া পড়িল।

সুরেন্দ্রনাথ একবার পিছনে ফিরিয়া দেখিল, ঘৃণায় তার মুখ কুঞ্চিত হইয়া গেল। মোটটা নামাইয়া দিয়া প্রমথ সুরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মেজদা, আপনার সামনে—"

সুরেন্দ্রনাথ বাধা দিয়া গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "কি করবো, ব্রাহ্মণের ছেলে গঙ্গাস্নান ক'রে এসে এই মেছুনিকে ছোঁবো আর ঘরে আমার নারায়ণ উপবাস যাবেন ? ছোটজাতে যা' পারে, ভদ্রলোকে তা' পারবে কেন !"

বৃদ্ধার মাথার মোটটা পুনরায় মাথায় তুলিয়া দিয়া, নিজের ঘটটি হাতে করিয়া প্রমথ নীরবে পথ চলিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ ঘাড় তুলিয়া প্রমথকে পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কানাই কাল তোদের বাড়ী গেছলো রে পিমে ? —"

প্রমথ মাথা হেঁট করিয়া ধীরে-ধীরে উত্তর করিল, "সে এই শীতে উঠ্‌তে পারবেনা ব'লে মা তাকে কাঁথা-ঢাকা দিয়ে শুইয়ে রেখেচে।"

সুরেন্দ্রনাথের মুখখানা সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। প্রমথ একটু থামিয়া সরলভাবে পুনরায় বলিল, "মেজদা, আজ কেনোর বাড়ী যেতে একটু বেলা হবে।"

সন্দেহদৃষ্টিতে একবার প্রমথের মুখের দিকে চাহিয়া সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

মুখ নত করিয়া প্রমথ উত্তর করিল, "বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ আর সেই সঙ্গে মা বলচে, তুলসী দিয়ে নেবে; সময়টা বড় খারাপ পড়েচে কিনা মেজদা!"

"তা, কেনো কি করবে?"

হাসিয়া প্রমথ বলিল, "পুরুতগিরি। মাকে সে কোনমতে কাল অন্য বামুনের কাছে যেতে দেয়নি।"

সুরেন্দ্রনাথের শিরায়-শিরায় অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে আর কোন অছিলা না-পাইয়া প্রমথের হাতের ঘটটা দেখিয়া বলিল, "এই বাগ্‌দি-ছোঁয়া ঘট্‌টায় কি নারায়ণকে আবির্ভাব হ'তে ডাকা হবে? ছোট-জাতের কাণ্ডই আলাদা!"

প্রমথের অন্তঃকরণে এ-কথাটা বড় লাগিল। সে জোর করিয়া বলিল, "এ-ঘটে যে গঙ্গাজল আছে, অশুদ্ধ হয় কি মেজদা? তা-ছাড়া যে হাতে ক'রে একজনের প্রাণ রক্ষে করেচি সেই হাতে করেই যখন ঘটটি এতদূর ব'য়ে এনেচি, তখন গঙ্গা কেন, আরও পাঁচটা মহানদীর জল এতে

এসে পড়েচে ; এখন আমার মনে হয়, কোন ব্রাহ্মণ মন্ত্র প'ড়ে ভগবানকে না-ডাকলেও বোধহয় তিনি ঘট্‌টির মধ্যে এসে অধিষ্ঠান ক'রেছেন !"

সুরেন্দ্রনাথ আবার বদলাইয়া গেল। এই ছোটছেলে দু'টার কথাগুলা কেমন আকার লইয়া যে তাহাকে বার-বার আক্রমণ করে, যেখানটায় সে আত্মরক্ষা করিবার কোন অস্ত্রই পায়না। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা কানাই এমনি করিয়াই তার শিক্ষার অহঙ্কারটাকে গুঁড়া করিয়া দিয়াছিল, আজ আবার তাহারই একজন সঙ্গী, ছোট-জাতের ছেলে, তার ধর্ম্মের, তার শুচিতার দৃঢ় প্রাসাদটাকে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া নিজের জয়ঘোষণা করিয়া গেল। শিক্ষা, ধর্ম্ম—এই দুইটা জিনিষকে তবে কি সে বরাবরি ভুল বুঝিয়া আসিয়াছে? তাহার হৃদয়ে সন্দেহের ঝড় উঠিল, সে হন্‌হন্‌ করিয়া চলিয়া গেল।

*

*   *

কানাইকে লইয়া সুরেন্দ্রনাথ যখন গৃহে ফিরিল তখন বেলা দশটা। স্ত্রী মুখটি গম্ভীর করিয়া রিক্তস্বরে কহিল, "সেই চান ক'রে এসে, দাঁতে কিছু না-কেটে যে বেরিয়েছিলে, এখন যদি একটা অসুখ করে কে দেখবে, শুনি? যাদের জন্যে এত করচো তারা তখন—"

সনাতনী দেখিতে পাইল, সুরেন্দ্রনাথ আজ স্বহস্তে কানাইয়ের গা-হাত

মুছাইয়া দিতেছে; দুই ভায়ে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যেন অনেকদিনের পর ভ্রাতৃতীর্থের সৃজন করিয়াছে। আজ সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতৃত্বের অভেদ্য বর্ম্মটার গায়ে লাগিয়া সনাতনীর অন্তরনিঃস্রাবী বিষাক্ত সূচালো শরগুলো খান্‌খান্ হইয়া গেল, তাহাদের একটিও না-পারিল প্রবেশ করিতে, না-করিল ক্রিয়া! কাজেই সনাতনীর মুখের কথা মুখেই মিশাইল। সে তথনকার মত নিস্তব্ধ হইয়া স্বামীর আসনের কোলে ভাত বাড়িয়া দিয়া গেল। একবার তাহার জ্বালা-জ্বালা অন্তর হইতে বাহির হইয়া পড়িল, "ভাতগুলো যে শুক্‌নো হ'য়ে গেল, বসা হবে কি না? এতবড় ছেলে, ও কি আর নিজের গা নিজে মাজ্‌তে জানেনা?"

সুরেন্দ্রনাথ চাপা-স্বরে উত্তর করিল, "ওইটে মনে করেই তো আজ তিন-চারটে বছর ওকে সব নিজে হাতেই ক'রে নিতে হয়েচে! আজকের বারে বাবা মরেছিলেন, মনে আছে মেজবউ? তোমার হাতদুটো ধ'রে তিনি তাঁর বড় আদরের এই অভাগাটাকে তুলে দিয়ে গেলেন? আজ যদি তার পিঠে এখনও সাতপর্দ্দা জমাট কাদা থাকে, তাহ'লে—?"

সনাতনী মুখ নত করিয়া রহিল, কোন উত্তর করিলনা। সুরেন্দ্রনাথ ভায়ের হাত ধরিয়া আসনে আসিয়া বসিল, নিজের মুখে আগে না-তুলিয়া ভায়ের মুখে তুলিয়া দিল। কানাইয়ের চোখে জল টল্‌মল্ করিতে লাগিল। সে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে একবার ডাকিয়া উঠিল, "মেজদা!"

"ভাই?"

কানাই জলভরা চোখে আস্তে-আস্তে বলিতে লাগিল, "আমি যখন অজাত হ'য়ে গেছি, তখন তোমার পাতের খেয়েই থাকবো ; আমায় পাতে ক'রে নিয়ে খেয়োনা মেজদা, তাহ'লে মেজবৌদি তোমার মাথা নীচু ক'রে দেবে !"

সুরেন্দ্রনাথ ভায়ের মুখে এক থামোল তুলিয়া দিতে-দিতে ভাইকে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ওরে কেনো, আমরা দু-ভায়ে সমাজ ছেড়ে, উঁচু-নীচু ছেড়ে অজাতই থাকবো, নাই-বা গোস্বামীদের সঙ্গে এক পুঁক্তিতে ব'সে খেতে পেলুম !"

সনাতনী তরকারি দিতে আসিয়া দেখিল, সুরেন্দ্রনাথ ও কানাই একপাতে বসিয়া খাইতেছে। সে ডাল্নার কাঁসিটা আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঐ মহাপাপটা তুমিও ক'রলে ? যে কৈবোত্তের হাঁড়ীর ভাত খায়, তার সঙ্গে একপাতে ব'সে খেলে ?"

সুরেন্দ্রনাথ হাসিয়া উত্তর করিল, "পিমে আর পিমের মা, এদের চাইতে বড় বাহ্মণ এ-তল্লাটে আছে কি মেজবউ ? এদের যেদিন হাঁড়ীর ভাত খেয়েচে, সেদিন থেকেই তো কানাই যথার্থ ব্রাহ্মণ হ'য়েচে !"

"আমার বাপের বাড়ীর কেউ তোমার এখানে পাত পাড়বেনা— তুমি যখন ধর্ম্ম—"

বাধা দিয়া সুরেন্দ্রনাথ উত্তর করিল, "ধর্ম্মের কথা গোস্বামীরা জানেনা মেজবউ, জানে ঐ কৈবোত্তেরা !"

মেজবউ রণে ভঙ্গ দিয়া রোষের কবাটে খিল দিল। রমা দালানের একপাশে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ সবই শুনিতেছিলেন। তাঁর চোখ দিয়া আনন্দ-অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি ছুটিয়া আসিয়া ডাকিলেন, স্থরেন!"

"মা?"

"এমনি ক'রে রোজই কানাইকে পাতে ক'রে নিয়ে খাস্ বাবা, আমি মরেও স্থখী হব!"

স্থরেন্দ্রনাথের চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। সে শকড়ি হাত-ছটা লইয়াই মায়ের পা-দুখানি জড়াইয়া ধরিল, বলিল, "মাপ্ কর মা, আশীর্বাদ কর, আমরা যেন দুজনে এক হ'য়ে থাকি। অনেক লেখাপড়া শিখিয়েছিলে মা, কিন্তু বুকের মধ্যে তার কেবল একটা তাত্তই ছিল, গলিয়ে দেবার মত কিছুই ছিলনা। আজ কৈবোত-পিসীর কাছে কানাইকে খুঁজতে গিয়ে স্থরেন্দ্রনাথ বদলে গেছে—তোমরা বুঝবেনা পিমের মা কতবড়!"

স্থরেন্দ্রনাথ কানাইয়ের হাত ধরিয়া উঠিয়া পড়িল। রমা দেখিল, একটা পাহাড়ের বুক চিরিয়া যে দুইটা নদী দু-মুখে বাহির হইয়া গিয়াছিল, তারা নীচের দিকে ছুটিয়া, ঘুরিয়া একস্থানে আসিয়াই আবার মিশিয়াছে।

*

* *

দেখিতে-দেখিতে প্রমথের কর্ম্ম-জীবনের দশ বারো বৎসর কাটিয়া গেল। সেইদিনকার সেই স্কুল-হইতে-প্রত্যাখাত প্রমথ আজ সারা গ্রামের প্রমথ, সমস্ত কৃষকসমাজের প্রমথ, মানকারার গৃহস্থদের মধ্যে যাঁহাদের উপর লক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়িয়াছে প্রমথ তাঁদেরও একজন। পরিশ্রমই যে সৌভাগ্যের মূল, প্রমথ ত্রিশ-বিঘা জমি ভাগে লইয়া, আজ এতবড হইয়াই তাহা বর্ণে-বর্ণে খতাইয়া মিলাইয়া দিয়াছে। সিতুর চোখের জল আর বুকফাটা কাতরতা পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, একজনের পায়ে গিয়া না-পৌঁছিলে কি একজন কুঁড়ে ঘরের অধিবাসী, যার একজনও আত্মীয় নাই, সহায় নাই সে এমন করিয়া উঠিতে পারে ? তাঁর কাছে তো অবিচারের একটা কণাও নাই, তাঁর কাছে তো ছোট-বড়র ভেদ নেই, তিনি যে অতি ছোটর মধ্যেও প্রাণের সন্ধান পাইলে তাহাকে আদর করিয়া শত ঋষির সাধনার সম্পদ নিমিষে বিলাইয়া দেন !

সিতু তো আজ সেই কুঁড়েতে নাই ; আজ ভগবান তাহাকে ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন, অট্টালিকা দিয়াছেন। সেও সময় বুঝিয়া এতবড় বাড়ীটায় একটি গৃহদেবীর প্রতিষ্ঠা করিতে প্রমথের বিবাহ দিয়া রাণীর মত রাণী ঘরে আনিয়াছে।

সকাল-বেলা। রোদ উঠিয়াছে। গৃহের কাজগুলি সারিয়া রকে বসিয়া সিতু নব পুত্রবধূর মাথার চুলের বেণী খুলিয়া দিতেছিল: এমন সময় হারাণ আসিয়া ডাকিল, "মা, তোর সুবল-ছেলে আজ তোর পেসাদ খেতে এয়েচে গো!"

সিতু আনন্দে বলিয়া উঠিল, "যশোদার কাছে কি আর সুবল, কানাই আছে বাবা, মার কাছে সব ছেলেই এক!"

হারাণ বাড়ীর ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। বধূ ছাদের উপর দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল। হারাণ দেখিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল, "এমন ক'রে যদি এই ষাট বছরের বুড়োর সামনে থেকে তুমি রোজ-রোজ পালাও নাতবৌ, তা'হলে এ-বাড়ীতে আর আসবোনা। তোমাকে নতুনগিন্নী ব'লে ডাকবো, সুখদুখের দুটো কথা কইবো—তবেই না সাধ মিটবে—কি বল মা?"

হারাণ হাসি চাপিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সিতুর দিকে চাহিল।

সিতু হাসিয়া উত্তর করিল, "শোধ একদিন নিয়ো বাবা; যেদিন পায়ের দরদ হবে ব'লে পাঠিয়ো, দুষ্টু বেটীকে দেখি তখন তোমার ঘরে গিয়ে পাদুটোয় তেল-মাখিয়ে দিয়ে আসতে হয় কিনা!"

"অমন কথা ব'লোনা মা, আশীর্ব্বাদ করি ও—"

এমন সময় প্রমথ স্নান করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সিতু আঙ্গুল বাড়াইয়া হারাণের পায়ের দিকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "নে, পায়ের ধুলো নে; আশীর্ব্বাদ কর বাবা, যেন ও অক্ষয় অমর হয়!"

প্রমথ মায়ের কথামত হারাণের পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পায়ের

ধূলা মাথায় দিল। হারাণ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে একবার বলিল, "মা, তোরা বড় হ'বি না তো হবে কে ?"

"বড়—সে তো তোমাদেরই আশীর্ব্বাদে বাবা !"

প্রমথ কাপড় ছাড়িয়া হারাণকে লইয়া জল খাইতে বসিল। হারাণ মুড়ি চিবাইতে-চিবাইতে বলিল, "একটা কথার জন্যে এসেছিলুম—"

"বল' দাদা !"

হারাণ উৎসাহে বলিতে লাগিল, "পূব-পাড়ার শিবু ঘোষকে চেনো তো ?"

"কেন, কি হয়েচে ?"

"না—ছাপুষ্যি, জেলার কোন আপিসে চাকরি ক'রে দশ বারোটি টাকা পায়, সংসারে তো রোজই কষ্ট—"

প্রমথ বাধা দিয়া বলিল, "কষ্ট সে যে ইচ্ছে করেই নিয়েচে দাদা !"—

"তা' যাই হোক। এখন সে আমায় ক'দিন ধরেচে, তার তো আর খ্যামতা নেই, তুমি যদি তার ছেলেটিকে পড়াও—ক'টাকাই বা খরচ ?"

প্রমথ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ দাদা, এত কষ্ট পেয়ে এখনও সে ছেলেকে পড়াতে চায় ? নইলেই বা দুর্গতি হবে কেন !"

হারাণ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একথা তুমি কেন বলচো ভাই, ইচ্ছে নাহয় থাক্।"

প্রমথের চক্ষু দুইটা লাল হইয়া উঠিল, সে রাগিয়া বলিতে লাগিল, "ইচ্ছে ? তুমি কি বলচো দাদা ? শিবু ঘোষ তো গয়লার ছেলে—

গাই পেলে দুধ, ক্ষীর, দই তৈরি ক'রে বিক্রি করাই না তার জাত-ব্যবসা ? আজ যদি সে ওই পনেরোটা টাকার জন্যে উদয়-অস্ত না-খেটে, পাঁচটা গরু নিয়ে নাড়া-চাড়া করতো, তাহ'লে দেখতে দাদা, তার সংসারটার চারিদিকে লক্ষ্মীর চিহ্ন ফুটে উঠতো। গাই যে ওর লক্ষ্মী, এতেই যে ওর উন্নতি হবে। তুমি ভেবোনা দাদা, কর্ম্মভেদে যেসব জাতভেদ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ক'রে গেছেন, সেগুলোর কিছু দাম নেই ; আজ যদি আমাদের দেশের সবাই চাকরি ছেড়ে যে যার জাত-ব্যবসা করতো, তাহ'লে কি দেশটা এত গরীব বলে চিনতে পারতে—"

একটু থামিয়া নম্রগলায় প্রমথ আবার বলিতে লাগিল, "রাগ করোনা দাদা, বড় দুঃখে এই কথাগুলো বলেচি, আচ্ছা, আসি তাহ'লে।"

প্রমথ চলিয়া গেল, হারাণ বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিল, কথাটা সত্য। তাহাদেরই শৈশবে পল্লীর ঘরে-ঘরে শ্রী ছিল—বারোয়ারীতলায় যাত্রা, তর্জ্জা, কথকতা হইত, নিত্য পার্ব্বণ, হরি-সংকীর্ত্তন ও দু-চার ক্রোশের মধ্যে একটা-একটা মেলা প্রায়ই লাগিয়া থাকিত, আর আজ গ্রাম ছাড়িয়া চাকররি মোহে ঘরের ছেলে সহরে বাস করিয়া পর হইয়া গিয়াছে। পল্লী-শ্মশানে কেবল তারই মত নিরুপায় যাহারা, তাহারাই পড়িয়া আছে। এই সেদিনকার ছোট-ছেলেটাকে এরা এইজন্যই এদের সমাজের প্রধান বলিয়া মানে, তার কথাগুলিও বেদের চাইতে সত্য বলিয়া জানে।

"নাও।"

প্রমথ ফিরিয়া আসিয়া যখন হারাণের হাতে দুটি গরুর দড়ি তুলিয়া

দিল, হারাণ তখন চমকিয়া উঠিল। প্রমথ হাসিয়া বলিতে লাগিল, "ওই যে মা, তুমি ওঁকেই জিজ্ঞেস করনা দাদা, লেখাপড়া করার চেয়ে জাত-ব্যবসা করাই ভাল কিনা। একটু যা' শিখেচে তাই ঢের; চাকরির জন্যে যদি লেখাপড়া শিখতে হয় তবে তাদের ব'লো যে, এই গরু দুটো ভালো ক'রে পালন করলে, বাপের চেয়েও ছেলে দু-পয়সা বেশী বই কম রোজগার করবেনা!"

হারাণ অবাক হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। শুধু একবার ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এই গরু দুটো—"

"হ্যাঁ-দাদা—দাও-গে!"

*

* *

লেখাপড়া শিখিবার জন্য সুরেন যেদিন কানাইকে সাগর-পারে পাঠাইয়াছিল সেদিন সে মনে করিয়া রাখিয়াছিল যে, ভাই সিবিলিয়ান হইয়া আসিলে সমস্ত বংশটারই মুখ উজ্জ্বল হইবে। একদিন তারই ঠাকুর্দা নিশিকান্ত ন্যায়রত্নের পাণ্ডিত্যে সমস্ত বাংলা দেশটা চমকিত হইয়াছিল। সে কথায়-কথায় বলিত, 'কেনো তাঁর নাম রাখবার উপযুক্ত হ'য়েচে।' কানাই কিন্তু যাবার দিনে চোখের জল মুছিতে-মুছিতে বলিয়াছিল, "কখনো তো আমি তোমার অবাধ্য হইনি মেজদা, আজও হবোনা, কিন্তু আমার মন বলচে, যে-সুখের আশায় তোমরা আমায় অতদূরে পাঠাচ্চো, ফিরে এলে হয়ত সুখের চেয়ে দুঃখই পাবে বেশী!"

সুরেন তখন এত আত্মহারা যে ভায়ের কথাটার ওজন ঠিক করিতে পারিলনা। মা জানিলেন, কানাই এদেশ ছাড়িয়া ভারতবর্ষেরই কোন এক জায়গায় লেখাপড়া শিখিতে গিয়াছে।

ইহার তিন-চারবৎসর পরে যখন বিলাত-ফেরতাদের সমাজে গ্রহণ করা হইবে কি-না ইহা লইয়া দেশে বিষম আন্দোলন চলিতেছিল, তখন লণ্ডনের ইষ্ট-এণ্ডের এক ব্যারাকে ভারতেরই একখানা কাগজ কানাইয়ের হাতে গিয়া পড়িল। কানাই হাসিয়া দাদাকে লিখিল, "দাদা, এখন সত্যিই কি মনে হ'চ্চে না যে, কানাই ভূমধ্য-সাগরে অনেকদিন ডুবে মরে গেছে?" আরও অনেক কিছু লেখার পর কানাই ভাবিয়া-চিন্তিয়া জানাইয়াছিল, "দেশে ফিরবোনা।"

সুরেন দু-একজন অতি নিকট আত্মীয়ের কাছে সাহস পাইয়া ভাইকে লিখিয়া পাঠাইল, "তুমি কিছু চিন্তা করোনা ভাই, সামান্য কতকগুলো টাকার মুখে দেশের এই অসার আন্দোলনটা চাপা প'ড়ে যাবে।"

আরও একটা বৎসর কাটিয়া গেল। এ-বৎসর রমার পঞ্চমী-ব্রতের উদ্‌যাপন। মাঘের ঘন কুয়াসা ভেদ করিয়া, আম্রের মুকুলগুলির উপর শ্রীহস্ত বুলাইয়া দিয়া, নূতন যব-শীর্ষের দুই-চারিটি বসন্ত-রংয়ের কাপড়খানারই হেম-অঞ্চলে বাঁধিয়া, শ্বেতপক্ষ হংসের উপর চড়িয়া যখন রমার দেবী-মণ্ডপের উপর একজন আসিয়া দাঁড়াইল তখন সমস্ত দিকটা হাসিয়া উঠিল।

মায়ের পূজার আয়োজনে সমস্ত বাড়ীটা ব্যস্ত। ব্রাহ্মণ পূজায় বসিয়াছেন। ধূপ, ধুনার গন্ধে সমস্ত বায়ুটা আমোদিত হইয়া উঠিতেছে। দ্বারে দাঁড়াইয়া একজন মঙ্গল-মালার দু-একটা

পাতা ছিঁড়িতে-ছিড়িতে একদৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া আছে। যেন সে সকলের সঙ্গে পরিচিত ছিল, কতদিন এই উৎসবের চত্বরে নাচিয়া-খেলিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু আজ যেন সে-সাহস নাই, ছুটিয়া গিয়া পাঁচটা ছেলের সঙ্গে মিশিয়া আজ যেন সে খেলিতে পারেনা। আজ তার আহ্বান নাই, আজ যেন সে এদের কেহ নয়। কিন্তু যখন সকলেই সেই মধুর স্তোত্রটি গাহিয়া অঞ্জলি দিতে গেল, তখন সে ছল-ছল চোখে মাটির দিকে চাহিয়া, জীর্ণ বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া একবারমাত্র ডাকিল, "মেজদা!"

যে প্রস্তুত ছিল তাহার কাণে গিয়া বাজিল; সাড়া আসিল, "ভাই!"

"আমি এসেছি।"

সুরেন আনন্দে ছুটিয়া আসিল। ক্ষণকালের জন্য সমস্ত উৎসবটা থামিয়া গেল। রমা পাগলিনীর মত দৌড়াইয়া আসিতে-আসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে সুরো—আমার কেনো?" কিন্তু রমা যখন দ্বারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাহার অন্তরাত্মাটা একবার কাঁপিয়া উঠিল, দেখিলেন, দুই ভাই মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কানাই মাকে দেখিতে পাইয়া তাঁর পায়ের তলায় গড়াইয়া পড়িল; অশ্রুপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "মা, সবাই পুষ্পাঞ্জলি দিতে পাবে, আমি পাবোনা?"

রমার চক্ষু আনন্দে সিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি পুত্রের শিরচুম্বন করিয়া উৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "তুই যে প্রথম বছর দু'আনার ঠাকুর কিনে এই ব্রতটার আরম্ভ করেছিলি বাবা, আয়!"

রমা পুত্রের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। সুরেন মুগ্ধ হইয়া

দেখিতে লাগিল, পূর্ব্বাপর সব ভুলিয়া গেল—বাধা দিতে পারিলনা। কিন্তু সে বুঝিল, আজ একটা মহা-অনর্থের সূত্রপাত হইতে চলিল। তথাপি এই মধুর স্বপ্ন-দৃশ্যটা তার চোখে এত রমণীয় ঠেকিল যে, মুহূর্ত্তের জন্য সে তন্ময় হইয়া গেল।

পুত্রের হাত ধরিয়া দেবীমণ্ডপের উপরে উঠিয়া পুরোহিতকে লক্ষ্য করিয়া রমা বলিলেন, "বাবা, তোমাদের দাস আমার কানাই এয়েচে—এর মাথায় একবিন্দু গঙ্গাজল দাও, পুষ্পাঞ্জলি দেবে।"

ব্রাহ্মণ সহসা চমকাইয়া উঠিলেন, পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, কানাই নতমুখে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি আসন ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলেন, ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার নারায়ণ নষ্ট হ'য়ে গেল! সুরেন কোথায়? আজ থেকে মুখুজ্যে-বংশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক উঠ্‌লো। যারা সাগর পার হ'য়ে এলো, তারা কোন সাহসে হিন্দুর পূজা-অনুষ্ঠানের মণ্ডপে এসে দাঁড়ায়? ঘোর অনাচার!"

কানাইয়ের চোখ দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতেছিল। সে একবারমাত্র মুখ ফুটিয়া বলিল, "দাদাঠাকুর, সাগর পার হওয়া যদি সত্যিই অহিন্দুর কাজ হয়, তাহ'লে আমি আপনাদের কোনো অনুষ্ঠানের সামনে এসে কখনো দাঁড়াবোনা, কিন্তু আজ যার পূজো কচ্চেন, তাঁরই সেবা করতে—তাঁকেই চিন্‌তে আমি এতবড় পাপটা করেচি।" একটুপরে কানাই আবার বলিতে লাগিল, "আর কারোর পায়ে অঞ্জলি দেবার অধিকার কানাইয়ের না-থাকুক, কিন্তু সরস্বতীর পূজোর অধিকার তার চিরকালই থাকবে।"

ব্রাহ্মণ ক্রোধ করিয়া চলিয়া গেলেন। সকলেই সুরেনকে নিন্দা করিতে-করিতে মুহূর্ত্তে সেই উঠানটা ফাঁকা করিয়া দিল। কানাই মুখ তুলিয়া একবার সুরেনের দিকে চাহিয়া বলিল, মেজদা, সেদিন যদি বিবেচনা ক'রে এই হতভাগাটার বিষয় ভাবতে তাহ'লে আজ—না, থাক্।"

কানাই মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া সেই দেবী-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সজল নয়নে বলিল, "মা, তুমিই জানো, কানাই তোমার পূজোর কতটা অধিকারী!"

আর বিলম্ব না-করিয়া কানাই বেগে বাহির হইয়া গেল। রমা, সুরেন কেহ তাহাকে একবার বাধা দিলনা, সকলেই জড়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। রমা এক-পলক পরে চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন।

*

* *

হারাণের আট-চালার সন্মুখে আজ যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে মানকারার তিপ্পান্ন ঘর কৈবর্ত্তের মধ্যে জাতি-হিসাবে যাহারা দাবী করিতে পারে, তাহারাই সমাজের প্রতিনিধি হইয়া কালী মাইতি, বিহারী মান্না ও শ্রীধর মাজীর বিচার করিতে আসিয়াছিল। একটা বৎসর ধরিয়া এই তিনজন সমাজ পায় নাই, নাপিত পায় নাই, রজক অভাবে হীনের হীন হইয়াছে।

অপরাধ তাহাদের যতটুকু থাক বা যতবড়ই হোক, কিন্তু এই শাস্তিটা এত কঠিন যে, অতি বড় পাষাণের চক্ষু ফাটিয়াও একবিন্দু জল বাহির হয়। গত শ্রাবণে কালী মাইতির ভাঙ্গা খড়ের চালের শত ফাঁক হইতে যখন বৃষ্টিধারা বিছানার উপর গড়াইয়া পড়িয়া তাহার আটবৎসরের রুগ্ন কন্যাটিকে ভিজাইয়া দিল, তখন সে গ্রামের দ্বারে-দ্বারে গিয়া একটা দিনের জন্যও মজুর পায় নাই। সেই জলে ভিজিয়া মাসের শেষের দিনে যখন তাহাদের ছাড়িয়া মেয়েটি চলিয়া গেল তখন তাহার স্ত্রী কাঁদিয়া বলিয়াছিল, "বামাকে ঘরে যায়গা দিয়ে শেষে আমার এই সর্ব্বনাশটা করলে ?"

"কি করবো, লোকের কথায়—"

আর কিছু বলিতে পারিলনা, কালীর দুটি চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তারপর সে-বৎসর কাটিয়া গেল, আবার বর্ষা আসিল। একদিন সকাল-বেলা স্ত্রী তার হাত দুটি ধরিয়া বলিল, "ওগো, আবার যে সামনে সেই কাল বর্ষা এসে প'ড়লো। কোলের দিকে চেয়ে ছ্যাখো, সকলের পায়ে ধ'রে, আমার পৈঁছে, বাজু, নারকেল-ফুল বিক্রি ক'রে জাতের সঙ্গে ঝগড়া মেটাও!"

আকাশের দিকে চাহিয়া কালী উত্তর করিল, "আপনার তেজটাকে আর আমি রক্ষে করতে পারবোনা তা' জানি, তোমার কোলের ওপর যে আছে তার জন্যে কালী সব করতে প্রস্তুত! একটা বচ্ছর এই যে বন-মানুষ হ'য়ে রয়েচি, পেটের আধখানা ভর্ত্তি হয়না, ক্ষেতের গাছগুলো উপড়ে দিয়েচে, গোলার ধান চুরি করেচে, তাতেও কালীকে নড়াতে পারেনি, কিন্তু সেই মেঘভরা শ্রাবণের আকাশ আবার যে ফিরে এসেচে—"

তার পরদিনই হেঁটমাথা করিয়া কালী মাইতি হারাণ মণ্ডলের শরণাপন্ন হইল। বিহারী মান্না, শ্রীধর মাজীর বুকের মাঝে যদিও এমনি-ধারা একটা না-একটা যন্ত্রণার ইতিহাস ছিল, তবুও কালীর মত শাসন তাহারা কেহ পায় নাই।

সমস্ত সভাটার বাহিরে গলায় কাপড় দিয়া তিনজনই দাঁড়াইয়াছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, কেহ তাহাদের বসিতেও বলিলনা। তাহার উপর তাহাদের চেয়ে ত্রিশ বৎসরের ছোটরাও যখন তাহাদের সামাজিক দোষ ধরিয়া লাঞ্ছনা করিতে লাগিল, তখন অপমানে তিনজনেরই চক্ষু দিয়া ধারার পর ধারা নামিয়া আসিল। এমন সময় হারাণ হুঁকা মুখে দিয়া খিড়কীর দরজা দিয়া বাহির হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "তোরা কাঁদচিস্ কেন রে কালি, শ্রীধর ?"

তাহারা কেহই উত্তর দিলনা। কেবল কালী ছুটিয়া আসিয়া, স্ত্রীর রূপার গহণাগুলি আর নগদ একটাকা সাত আনা হারাণের সামনে রাখিয়া, তাহার পা-দুটি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "হারাণ খুড়ো, যা' আমার ছিল ধ'রে দিলুম ! এইটে দণ্ড নিয়ে এক-কাহন খড় চালে তুলতে হুকুম দাও খুড়ো ! আর-বছর আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েচে জানো তো, এখন যেটি আছে সেটিকে রক্ষে কর খুড়ো !"

কে একজন চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "আর-বছর মেয়েটি মরেচে, এ-বছর ছেলেটি না-মরলে পুরো দণ্ড দিয়ে সমাজে কি তোমার উঠতে ইচ্ছে হবে ?"

হারাণ জিভ্ কাটিয়া ফেলিল আর কালী মাইতি পাগলের মত

বলিল,"তোমাদের সমাজ, তোমাদের নাপিত, তোমাদের ব্রাহ্মণ কিছুই চাইনা—আর আমার কিছুই নেই, এই নিয়ে· চালটায় এক কাহন খড় তুলতে অনুমতি দাও—" একটু থামিয়া পাগলের মত কালী আবার বলিতে লাগিল, "আমার একরত্তি খুদের কোন্ তোমাদের কাছে কিছু না-হ'লেও আমার কাছে যে অমূল্য—আমার বুকের পাঁজ্‌রা—আমি সমাজ চাইনা !"

"মোড়লের পো ?"

"কে গো, বেরার-পো যে গো, অনেকদিন পরে—এসো এসো !"

হারাণ এবার বসিল ; আগন্তুকের দিকে হুঁকাটি বাড়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মনে করে বাবাজি ?"

"এলুম। জন্মভূমি দেখতে সাধ হয় তো, তার ওপর—"

ধূমনিঃসরণ করিয়া পুনরায় বলিল, "প্রমথকে আজ সাতদিন উকিলের চিঠি দিয়েচি, কোন জবাব তো সে আজ পর্য্যন্ত দেয়নি—"

একজন বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উকিলের চিঠি ! কেন গা সাধু-দা ?"

"তোমরা তো জানো নিধু, ওই ভিটেটা, যেটার ওপর পিমে এখন বাড়ী করেচে ওটা আমাদের পৈতৃক—"

অনেক কথার পর সাধুচরণ শেষকালে বলিল, "পিমে যদি স্ব-মানে ওর অর্দ্ধেক আমায় ছেড়ে না-দেয়, কাজেই আদালত থেকে এর একটা বিলি-ব্যবস্থা তো করতে হবে !"

"কেন, কাকা ?"

প্রমথ আসিয়া সাধুচরণের পায়ের ধূলা লইয়া সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকীমাকে পেসাদীদের বাড়ীতে না-তুলে এই হতভাগার কুঁড়েতে তুললে কি অপমান হ'তো কাকা ?"

নিধু উত্তর করিল, "তোদের সঙ্গে যে ঝগড়া !"

"কিসের ?"

নিধু এবারও জবাব দিল, "সাধুদা না তোকে উকিলের চিঠি দিয়েচে ?"

হাসিয়া প্রমথ উত্তর করিল, "ও ! দশ পনেরোটা বছর পরে যখন সেই চিঠিখানা আমার হাতে পড়্লো কাকা, নীচে তোমার নাম সই দেখলুম, তখন মনে করলুম, আজ এতদিনের পর প্রমথর আপনার বলতে যে একজন আছে সে খোঁজ নিয়েচে। কিন্তু তার পরে, সত্যি কাকা, তোমার পা-ছুঁয়ে বলচি, বড় দুখ্খু হ'লো, সেই অতবড় চিঠিখানায় জমি-জায়গা, টাকাকড়ির কথায় ভর্ত্তি ছিল, কিন্তু কোন একটু ফাঁকেও আমার খোঁজটা কি নিয়েছিলে কাকা ? কেউ আমার খোঁজ নেয়না কাকা !"

প্রমথ অনেকক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর সাধুচরণের পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, "কালই আদালতে গিয়ে ভিটে, জমি, প্রমথর যা' কিছু আছে, তোমার নামে লেখাপড়া ক'রে দিয়ে আস্‌বো। খুড়ো ভাইপোয় মামলা ক'রে—একে ছোট-জাত তায় আরও ছোট হবোনা কাকা ! যারা লেখাপড়া শিখে নিজের গণ্ডা ভালো ক'রে বুঝে নিতে শিখেচে, তারা নিজের সত্ত্ব বজায় রাখতে

মামলা করুক, আমাদের তো ও-সব নয় কাকা, আমার ও-সব কিছু চাইনা, কেবল তুমি আমায় দেখো !"

সাধুচরণের অন্তরটা সহসা শিহরিয়া উঠিল। কোথা হইতে একটা সুগন্ধি ধূপের গন্ধ আসিয়া তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল। সে ডাকিল, "প্রমথ, ওঠ্ বাবা !"

প্রমথ তথাপি মাটিতে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "মা পেসাদীদের বাড়ী থেকে কাকীমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেছে, আমার ভিটের সমস্ত ঘরগুলো খাঁ-খাঁ করচে, আমাদের দেখবার, শাসন ক'রবার কে আছে কাকা? নীজের ভিটেতে কার ওপর অভিমান ক'রে তুমি যাবেনা, শুনি ?"

"ওঠ্, চ—রে !"

সাধুচরণের চক্ষু দিয়া আজ অন্তর গলিয়া ফোঁটা-ফোটা করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

*

* *

"কালী !"

তখনও ভোর হয় নাই। ধুঁয়ার মত অন্ধকারের রাশি তখনও বাদলার আকাশটার চারিদিকে জমাট হইয়া বসিয়াছিল। আচ্ছন্ন মেঘ সারারাত্রিটা মাতালের মত, উন্মাদের মত বর্ষণ করিয়াছে।

প্রভাতের হাওয়ায় আরও যেন সে পাগল হইয়া উঠিল। গুরু-গর্জ্জন তুলিয়া মেঘরাণীদের বুকের যেখানটায় জলের ভাণ্ডার সেখানটা কাঁপাইয়া দিল। তখন উছল জলের রাশি পৃথিবীর মুখে নামিয়া আসিল। এমন সময়টায় কালী মাইতির ঘরের পিছনে দাঁড়াইয়া একজন ডাকিল, "কালী!"

কালী তো সারা রাত্রি জাগিয়া বসিয়া আছে। ঘরের কোথাও আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। স্ত্রী বুকে সাতপর্দ্দা ছিন্ন কাপড় দিয়া ছ-মাসের ছেলেটাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, আর কালী স্ত্রীর পিঠের উপর যেখানটায় তীরের মত জল আসিয়া পড়িতেছিল, সেখানটায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাথা দিয়া বসিয়াছিল। তার বুক বাহিয়া জলের ধারা নীচে পড়িতেছিল।

ঘরে একটা আলো সারারাত্রি মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সমস্ত রাত্রি ভিজিয়া, কাঁদিয়া, সকালটায় সে নিশ্চল পাথরের মত সকলের সব উপদ্রব উপেক্ষা করিয়া শূন্যমনে বসিয়াছিল। কিন্তু কাণটায় গিয়া যখন পৌঁছিল একজন তাহাকে ডাকিতেছে, তখন সে উন্মাদের মত উত্তর করিল, "সারা গ্রামটা যখন কালীকে ত্যাগ করেছিল তখনও কালীর আশা ছিল, কেউ না-দেখে একজন দেখবে; তার বিবেচনাও তো আজ দেখলুম ভাই, আর আমায় ডাকো কেন?"

উত্তর আসিল, "এক কাহন খড় মাথায় ক'রে একজন তোমার ঘরের পেছনে এই বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রয়েচে—"

বাধা দিয়া কালী চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, তোমার "খড় ফিরিয়ে

নিয়ে যাও। কালীর বুক যখন আছে, তখন তার বুকের চেয়েও বেশী যে তার গায়ে এক ফোঁটাও জল লাগবেনা !—"

"তবে ফিরে যাই ভাই ? সমাজের ওপর অভিমান ক'রে, তোর মতই একজন হতভাগাকে ফিরিয়ে দিলি রে !"

সহসা কালীর চমক্ ভাঙ্গিল। সে ছুটিয়া আসিল, চিনিল, চিনিয়া অবাক হইয়া গিয়া বলিল, "এখনও যে আমি বিশ্বাস করতে পারছিনি—তুমি ?"

এইবার মাথার খড়ের বোঝা ফেলিয়া যে আসিয়াছিল সে হাসিয়া উত্তর করিল, "হ্যাঁ রে, আমি, তাতে হয়েচে কি ? তোর কষ্ট কি আমার কষ্ট নয়—তোর ছেলে যে আমার ছেলে !"

কালীর চোখ দিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া জল পড়িতেছিল। সে পাগলের মত ঘরের ভিতর যাইয়া স্ত্রীর বুকের মধ্যে হইতে ছেলেটিকে কাড়িয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "হতভাগা কালীর পুঁজির মধ্যে এইটুকু,তুমি তাকে রক্ষে কর দাদা,এই নাও তোমার পায়ের তলায় রাখলুম !"

"এই বৃষ্টিতে খোকাকে কেন বের করলি কালী, যা' তাকে তার মায়ের কোলে দিয়ে আয় !"

কালী ঔদাস্যভরে ম্লান হাসিয়া উত্তর করিল, "বৃষ্টি কেবল এই বাইরে কি কালীর ঘরের ভেতরে একবার ভেতরে গিয়ে দেখে এসো !"

স্ত্রীর কাছে খোকাকে দিয়া কালী বাহিরে আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, "এই খড়গুলো তো দিলে, চালে তুলবে কে ? কালী যে এই কাজটা কখনো শিক্ষে করেনি।"

"যে এই খড়গুলো মাথায় ক'রে ব'য়ে আনতে পেরেচে, চালে তুলতেও সে পারবে, ভাবনা নেই !"

কালী নতমুখ হইয়া ছল্‌ছল্ চোখে আবেগের স্বরে বলিয়া উঠিল, "পাঁচশো বিঘে যার ধান-জমি, দশ বিঘে জুড়ে যার বসতবাড়ী, তার এসব কি কাণ্ড আজ দেখচি !"

"ঐটে মনে ক'রে তুমি এতটুকুও কিন্তু হ'য়োনা কালী, জাতের বিপদে জাত না-এসে দাঁড়ালে কে দাঁড়াবে ভাই ?"

কালীর চোখ দিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতেছিল। সে বলিয়া উঠিল, "তাহ'লে কাকেও কি আর কাঁদতে হয় প্রমথ !"

বলিয়া কালী জিভ্ কাটিয়া ফেলিল।

"তুমি যে আমার চাইতে বয়সে বড় ভাই—"

বলিয়া প্রমথ একধারে একটা বাঁশের মই লাগাইয়া চালে উঠিয়া পড়িল।

যখন আধখানা চালের মট্‌কা বাঁধা হইয়া গিয়াছে, তখন একজন টোকা মাথায় দিয়া যাইতে-যাইতে কালীকে খড় তুলিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার হুকুমে তুমি চালে খড় তুলচো কালী, জান্‌তে পারি ?"

কালী তাহার উত্তর করিলনা, উত্তর দিল প্রমথ, বলিল, "ও তোমাদের সমাজের ভয় আর রাখেনা, সমাজ রসাতলে যাক্ !"

টোকাটা তুলিয়া একবার উপর দিকে চাহিয়া সে বিষম রাগিয়া বলিল, "মোড়লের সঙ্গে কুটুম্বিতে আছে ব'লে তুমি যা' ইচ্ছে তাই করতে পারোনা প্রমথ, আমরা ইচ্ছে করলে তোমাকেও এক-ঘরে করতে পারি, জানো ?"

একটু থামিয়া সমান জোরে সে আবার বলিতে লাগিল, "জান তো, কালীর বোন্ বামাকে ডাকাতে তুলে নিয়ে গেছলো? সে পাঁচ-বছর পরে ফিরে এলে, এতবড় আস্পর্দ্ধা ওর যে তাকে জায়গা দিয়েচে নিজের ভিটেতে! সমাজ নেই? এখন টের পাচ্চে।"

প্রমথর আর সহ্য হইলনা, বলিল, "সমাজ না ভণ্ডামি? একটা অবলাকে রক্ষে করবার এতটুকু মুরোদ নেই, কেবল আছে বিচার করতে! আমরা তোমাদের মানিনা—বিচারকর্ত্তা!"

একটু থামিয়া আরও উত্তেজিত হইয়া সে বলিল, "এক-ঘরে হবার ভয় কাকে তুমি দেখাচ্চো মাখন? তোমাদের মত পাষণ্ডদের সঙ্গে মিশে থাকার চেয়ে—"

"কি হয়েচে রে মাখন?"

হারাণ ক্ষেতের দিকে যাইতে-যাইতে সেইদিকে আসিয়া দাঁড়াইল। মাখন তাহার কাণের কাছে মুখটি লইয়া গিয়া ঘটনাটি বুঝাইয়া দিল। হারাণ উপর দিকে চাহিয়া বলিল, "প্রমথ, দেশের লোক যেটায় রাগ করে, যাকে ত্যাগ করে, তুই সেথায় কেন দাঁড়াস ভাই? আয়, নেমে আয়!"

প্রমথ অবিচলিতের ন্যায় উত্তর করিল, "ইচ্ছে হয় সমস্ত কইবোতের সমাজ আমায় ত্যাগ করুক, তুমি আমায় ত্যাগ কর দাদা—আমি কিন্তু এই হতভাগাটাকে ত্যাগ ক'রে তোমাদের চাইনা!"

হারাণ অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কালকে সন্ধ্যেবেলায় তোর কাছে কালীর কথাটা যদি না-পাড়তুম, তাহ'লে বোধ হয় চিরকালটাই আমায় কসাই থাকতে হ'তো রে!—"

একটু থামিয়া হারাণ এবার মাখমকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যদি তোরা আমায় আর মোড়্‌লি দিতে না-চাস্ রে মাখম, তবে চেষ্টা ত্থাখ—আমি এ কসাইগিরি আর ক'রতে পারবোনা !"

কালী হারাণের পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

*

* *

চাঁদার খাতা লইয়া মানকারার ইংরাজী-স্কুলের মাষ্টাররা যখন প্রমথর সদরে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন সে দুইজন মুহুরীর সঙ্গে হিসাব দেখিতেছিল। পুরাতন শিক্ষক বেণী ঘোষাল প্রথমে আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, তার হাতের নিকট খাতাটি ধরিয়া বলিলেন, "ভগবান করুন তুমি আরও উন্নতি কর বাবা ! তোমার মানে যে আমাদের মান—"

তারপর পার্শ্বের শিক্ষকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা তো জানেননা, তখন প্রাণকৃষ্ণবাবু হেডমাষ্টার ছিলেন, এরা সব আমাদের হাতে-মানুষ-করা ছেলে !"

প্রমথ প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের খাতা, মাষ্টারমশাই ?"

রমণীবাবু বৎসর-দুই হেডমাষ্টার হইয়াছেন ; বলিলেন, "মানকারায় আপনার নাম জানেনা এমন লোক নেই। আমি যেদিন আসি, সেইদিন থেকেই আপনার দানের কথা শুনেচি—"

প্রমথ বাধা দিয়া বলিল, "বেশ, তাতে হ'য়েচে কি ?"

বেণীবাবু আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "তোমায় অত কথা ব'লতেই বা হবে কেন বাবা—তা' ভাল ক'রে স্কুল-বাড়ীটা তৈরি হ'চ্চে কিনা, তাই টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি অনেক জিনিষের আবশ্যক হ'য়ে প'ড়েচে ; তোমাকে বাবা এই চাঁদার খাতায় সই করতে হবে।"

প্রমথ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি-হিসেবে আপনারা আমার কাছে চাঁদা চাইতে এসেচেন ? কিছু মনে করবেননা মাষ্টারমশাই, আমার কাছে চাঁদা চাইবার অপনাদের কোন অধিকার নেই।"

বেণীবাবু বড় গলা করিয়া বলিলেন, "তুমি যে আমাদের স্কুলের একজন পুরোতন ছাত্র, ব'লতে কি, আজ যে তোমার এত উন্নতি—"

প্রমথ বাধা দিয়া উত্তর করিল,"তা' বোধ হয় ওই স্কুলে পড়ার দৌলতে, নয়? এই দেখুননা, দুটো হাতেই কড়া—উদয়-অস্ত লাঙ্গল ধরতে হয়েচে !"

বলিয়া সে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বেণীবাবু এবার যেন একটু লজ্জিত হইলেন। রমণীবাবু কিন্তু চতুর ব্যক্তি, কথাটার সঙ্গে-সঙ্গে কহিলেন, "তা' যাই হোক, আপনি যখন দেশজুড়ে লোকের সাহায্য করচেন, তখন দেশের ছেলেদের শিক্ষার পথ যাতে প্রশস্ত হয় তা' করা আপনার উচিত।"

বলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রমথর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "লেখাপড়া শিখে লাভ ?"

কেহ কিছু উত্তর দিলেননা।

প্রমথ যেমন বলিতেছিল তেমনি বলিতে লাগিল, "লাভের মধ্যে

এই দেখতে পাই যে, মুদীর ছেলে লেখাপড়া শিখে অবধি বাজারে আর বেশী বাঙালী-মুদীর দোকান দেখতে পাইনা, চাষার ছেলে লেখাপড়া শিখে দেশ থেকে চাষ-আবাদ উঠে যাচ্চে—এই তো আমাদের লেখাপড়া! আমরা একটুখানি প'ড়ে জাত-ব্যবসাকে বড় ঘেন্না করি, কাজেই ওতে লাভ অপেক্ষা লোকসানই হয় বেশী!—আপনি জানবেন মাষ্টারমশাই, মুখ্যলোকেরা এখনও এই দেশটাকে বাঁচিয়ে রেখেচে!"

বেণী ঘোষাল চটিয়া গেল; জিজ্ঞাসা করিল, "জগতের সভ্যজাতিরা তাহ'লে লেখাপড়াকে এত উঁচুতে আসন দিয়ে রেখেচে কেন, জিজ্ঞাসা করি?"

প্রমথ হাসিয়া উত্তর করিল, "মেজদা বলেন, তাঁদের দেশের কামারের ছেলে ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখে হাতুড়ি নিয়ে কামার-শালে কাজ করে; জাতব্যবসা ছেড়ে কদিচ্ চাকরি করতে যায়।"

বেণীবাবু রাগিয়া চলিয়া গেলেন। রমণীবাবু হাল ছাড়িবার পাত্র নন্, একবার শেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহ'লে কি আপনার কাছ থেকে শুধু-হাতেই ফিরতে হবে?"

"মাপ করবেন, বাঙালী যাতে ব্যবসায় উন্নতি করতে পারে এমন কিছু তৈরি করবার সময় যদি টাকার দরকার হয় তো আমার কাছে আসবেন, আমি আমার এই বসত-বাড়ীর ইট ক'খানা বিক্রি ক'রেও সাহায্য করবো!"

সকলেই অপমানিত হইয়া চলিয়া গেল। প্রমথ মুহুরীদের বিদায় দিয়া নিজেই পুনরায় হিসাব লইয়া বসিল। এমন সময় একজন ডাকিল, "পিমে?"

প্রমথর হাত হইতে খাতা পড়িয়া গেল। সে চমকিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

"পিসে কেমন আছিস্ রে?"

"কে রে, কেনো?"

প্রমথ ছুটিয়া গিয়া কানাইয়ের হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া আসিল। কানাই আসিয়া চৌকির উপর বসিল। প্রমথ জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছিস ভাই?"

কানাইয়ের চক্ষু দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। প্রমথ তার গলাটি জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েচে রে?"

"তুইও তো একদিন কেঁদেছিলি ভাই!"

"আমি?"

"হ্যাঁ, ক্লাসে উঠতে পারিসনি ব'লে?"

প্রমথর মুখ সহসা পাংশু হইয়া গেল; ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি তুই সে-দেশ থেকে ফেল হ'য়ে এলি রে কানাই?"

কানাই চোখের জল মুছিয়া উত্তর করিল, "না, তবে এরকম পাশ ক'রে লাভ কি?"

"কেন?"

কানাইয়ের চক্ষু আবার ভরিয়া আসিল, বলিল, "মেজদা আমায় বাড়ীতে জায়গা দিলে জাতিচ্যুত হবেন!"

প্রমথ বাধা দিয়া বলিল, "ও, বুঝেচি—বাড়ীর ভেতর চল্।"

"না।"

"কেন?"

"আজ পিসীমার সামনে দাঁড়াবার অধিকার আমার নেই!"

কানাইয়ের চক্ষু বহিয়া অনর্গল জল পড়িতে লাগিল। প্রমথর চক্ষুও ভিজিয়া আসিল। সে আবেগে বলিয়া উঠিল, "যেদিন তুই ব্রাহ্মণের গলার দু'খী সুতোকে তুচ্ছ ক'রে এই কৈবোত্তের ভাত খেয়েছিলি, সেদিন—আর আজ বিলাতফেরতাদের সমাজ চোখ রাঙিয়েচে ব'লে তোকে ত্যাগ করবো ?"

কানাইয়ের মাথায় একটা চাঁটি মারিয়া প্রমথ যেমন বলিতেছিল তেমনি বলিতে লাগিল, "সমাজের শাসন মানবে তোর মেজদা—আমরা কেন মানতে যাবো, আমরা যে ছোট-জাত !"

...... * * * ......

আই-সি-এস পাশ করিয়াও কানাই সরকারী চাকরি লইলনা, বাংলারই কোন একটা দেশে প্রমথর টাকায় Agricultural School খুলিয়া, দেশের ছেলেমেয়েদের কৃষি, প্রাণী, ভূ-বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিল এবং আনন্দে প্রমথকে লিখিল, "এ-প্রশংসা তো কানাইয়ের শিক্ষার নয়, ওপরটায় ছোট হ'য়ে তুমি যে বড় ভাবটা চিরকাল পুষে রেখেছিলে—তারই !"

ইতি—

শ্রীব্রজমোহন দাশ

পরবর্ত্তী আকর্ষণ—

কথা-সাহিত্যের যুগ প্রবর্ত্তক

ডাক্তার—

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

মহাশয়ের

সযত্ন-সজ্জিত

জালি

অতঃপর

'তরুণ-সাহিত্য-মন্দির' হইতে

প্রকাশিত হইবে

সর্ব্ববাদীসম্মত নূতন ধরণের শিশুসাহিত্য !

শ্রীসুকুমার দে সরকারের লেখা

যে বইখানি 'তরুণ-সাহিত্য-মন্দির' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে তা'র নাম—

সব-দিক-দিয়ে এই বইখানির এমন একটা লোভনীয় আকর্ষণ আছে যা' না-দেখে, কেবল বিজ্ঞাপন প'ড়ে অনুমান করা একেবারেই অসম্ভব। ছোট, বড় প্রত্যেকের সুখপাঠ্য এই উপহারের বইখানি এখনো যদি না-কিনে থাকো—যে-কোন বইয়ের দোকানে গিয়ে অন্ততঃ একবার দেখে এসো !

দু'টাকার উপযুক্ত এই বইখানির

দাম মাত্র ৸৹ বারো আনা, মাঃ ।৵৹

মোট ১৵৹ মণিঅর্ডার ক'রে পাঠালে ঘরে বসেই বই পাবে।

তরুণ-সাহিত্য-মন্দির—৫৯, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বহুখ্যাত সাহিত্যিক

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

পেস্তার বরফি

— এ পেস্তার বরফি —

গান্ধারের আমদানি পেস্তায় তৈরি খাবার বরফি না-হ'লেও—শিশুদের মনের ভিটামিন্-সংযুক্ত পুষ্টিকর খোরাক নিশ্চয়ই। এককথায় এই বইখানিকে শিশু-সাহিত্যের মেওয়া বলা চলে। কেননা, মেওয়ার মধ্যে যেমন আখরোট, কিশমিশ, পেস্তা, বাদাম—মুখে দিলেই আঃ, কি আরাম! ছোটদের বইয়ের মধ্যে এই 'পেস্তার বরফি' পড়লেও তেমনি বিরাম-বিহীন আরাম পাবে, তবে এর স্বাদ জিভে নয়—মনে।

বেশী কথায় কাজ কি?

একখানা কিনে দেখলেই বুঝতে পারবে

আমাদের কথা ও কাজের সামঞ্জস্য কতখানি।

ছবির কথা? অপছন্দ হ'লে অভিযোগ ক'রো!

তরুণ-সাহিত্য-মন্দির—৫৯, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙালীর অ-দৃষ্টপূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শিশুগ্রন্থ—

বাংলার একডাকে-চেনা কথা-শিল্পী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

কুবের-পুরীর রহস্য

'যকের ধন" "আবার যকের ধনে"র

সেই বিখ্যাত বাঙালী-যুবক

বিমল ও কুমারের

নূতন কীর্ত্তিকাহিনী!

রত্ন-শিকারের ভীষণ বিপজ্জনক ইতিহাস।

লেখাটি আগাগোড়া নূতন, ইতিপূর্ব্বে কোথাও

প্রকাশিত হয়নি।

দাম পাঁচ সিকা, ডাকব্যয় ।৵০

মোট ১৷৵০ মণিঅর্ডার ক'রে পাঠালে ঘরে বসেই বই পাবে।

তরুণ-সাহিত্য-মন্দির—৫৯, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যুগে-যুগে চিরন্তন সত্য—সাহিত্য!

জীবন-যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে আজ প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের প্রত্যেকেই একদিন গ'ড়ে উঠেছিলেন এই সাহিত্যের ভিতর দিয়ে। এতদিন ঠাকুরমার মুখের গল্পের ভিতর দিয়ে কল্পলোকে লুকিয়েছিল যে সাহিত্য—যুগ-যুগান্তের পর বাংলার খোকা-খুকু আর তরুণদের সাদর-আহ্বানে সেই শিশু-সাহিত্য নেমে এসেছে এবার সারস্বত-মন্দিরের সিংহদ্বারে! জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের এই প্রথম প্রবেশ-পথে যেতে চাও যারা, এগিয়ে এস'।

প'ড়ে মানুষ হবার মতো—সাংসারিক জীবনে কাজে-লাগার উপযোগী কয়েকখানি জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিশুগ্রন্থ—

হানাবাড়ী—শ্রীসুকুমার দে সরকার

পেস্তার বরফি—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কুবের-পুরীর রহস্য—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দুর্গম জঙ্গলে—শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

অচিন পথে—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বড়ো-ভালো-লাগে—শ্রীব্রজমোহন দাশ

এই বই ক'খানি বাংলার সমস্ত বইয়ের দোকানেই পাবে।